BDeBooks.com

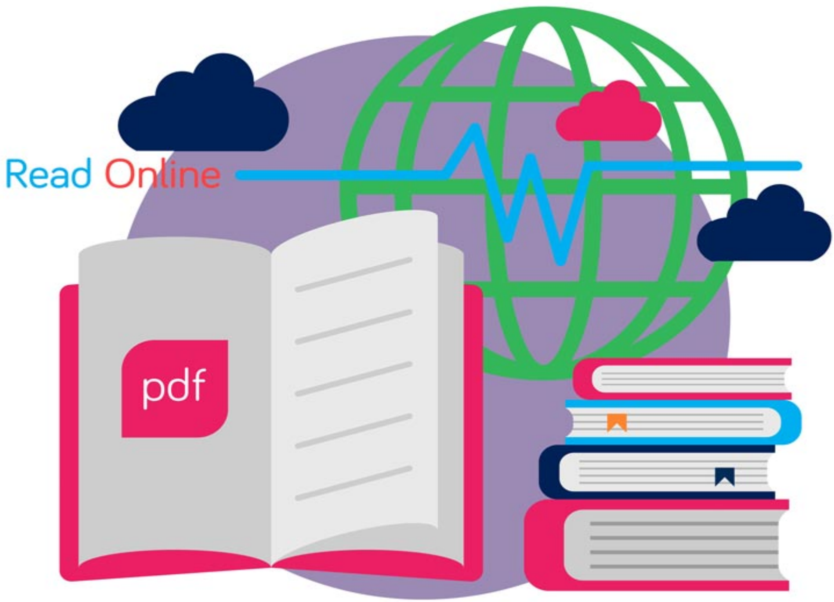

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

একেই বলে শুটিং

সত্যজিৎ রায়

ভূমিকা

ফিল্ম তৈরির কাজটাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হল লেখা, দ্বিতীয় ছবি তোলা, আর তৃতীয় ছবি জোড়া।

যে ছবি লোকে পর্দায় দেখবে, সেটাই প্রথমে গল্পের মতো করে গুছিয়ে লেখা হয়। একে বলে চিত্রনাট্য।

এই চিত্রনাট্য অনুসরণ করে যখন ছবি তোলা শুরু হয়, তখন সে কাজটার জন্য প্রধান হাতিয়ার হল ক্যামেরা আর শব্দযন্ত্র। এই কাজটাকেই বলে শুটিং।

শুটিং হয়ে গেলে, টুকরো টুকরো ভাবে তোলা দৃশ্যগুলো চিত্রনাট্যে যেমন আছে তেমন করে পর পর সাজিয়ে যে জিনিসটা তৈরি হয় সেটাই লোকে পর্দায় দেখে।

এর মধ্যে শুটিং পর্বের কাজেই সব চেয়ে বেশি ঝামেলা আর পরিশ্রম। এই কাজটা অনেক সময় স্টুডিওর ভিতর না হয়ে হয় বাইরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে।

গত পঁচিশ বছরে আমাকে ছবির শুটিং-এর জন্য ভারতবর্ষের নানান জায়গায় যেতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে তিনটে ছবিতে—গুপী গাইন বাঘা বাইন, সোনার কেল্লা, আর জয় বাবা ফেলুনাথ। বীরভূমের গ্রাম, বেনারসের অলিগলি আর ঘাট, সুদূর পশ্চিম রাজস্থানের মরু অঞ্চল, সিমলার বরফের পাহাড় ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় শুটিং করতে গিয়ে আমাদের যে সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারই কয়েকটার কথা বলা হয়েছে এই বইতে।

এই ধরনের ঘটনা ঘটে বলেই অনেক সময় মেহনতটা আর গায়ে লাগে না। আর বাধা যেসব আসে, সেগুলো অতিক্রম করে কাজটা যদি ঠিক মতো উতরে যায় তা হলে তো আর কথাই নেই।

সত্যজিৎ রায়

অপুর সঙ্গে আড়াই বছর। কাশবনে দুর্গা ও অপুকে দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন পরিচালক।

মেঘের অপেক্ষায় সকলে বসে।

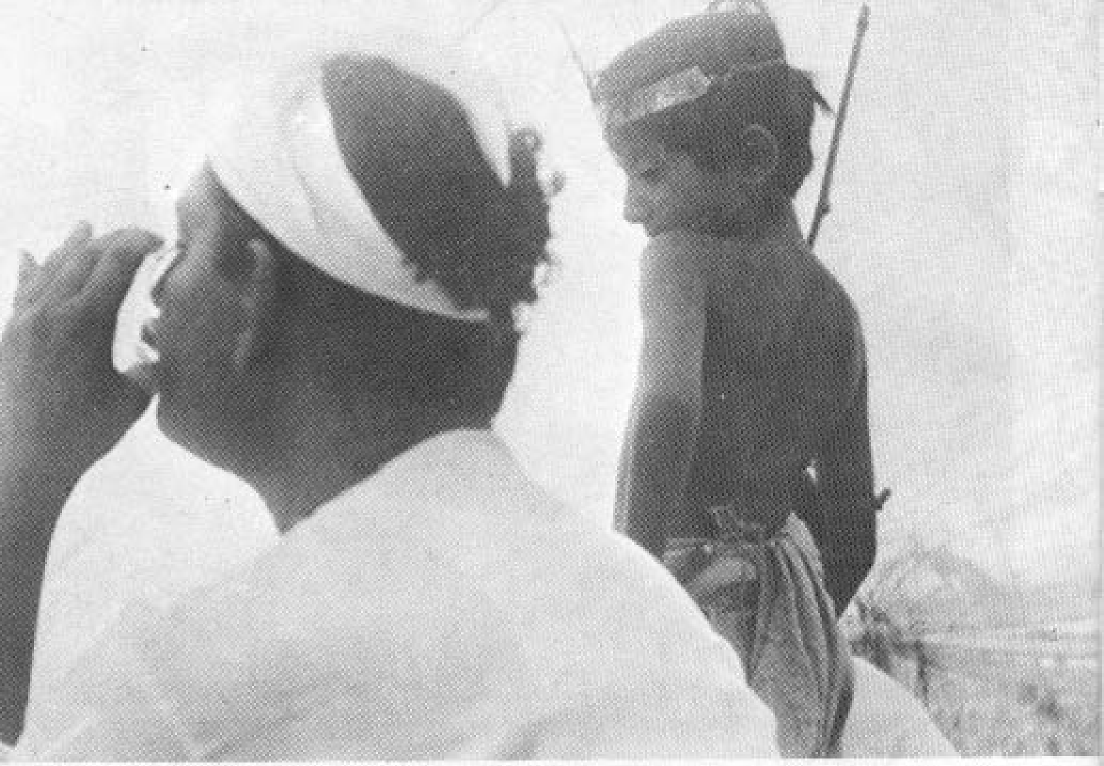

চায়ের বিরতি। পরিচালক ও অপু।

কাজের ফাঁকে ভাই-বোনের আড্ডা।

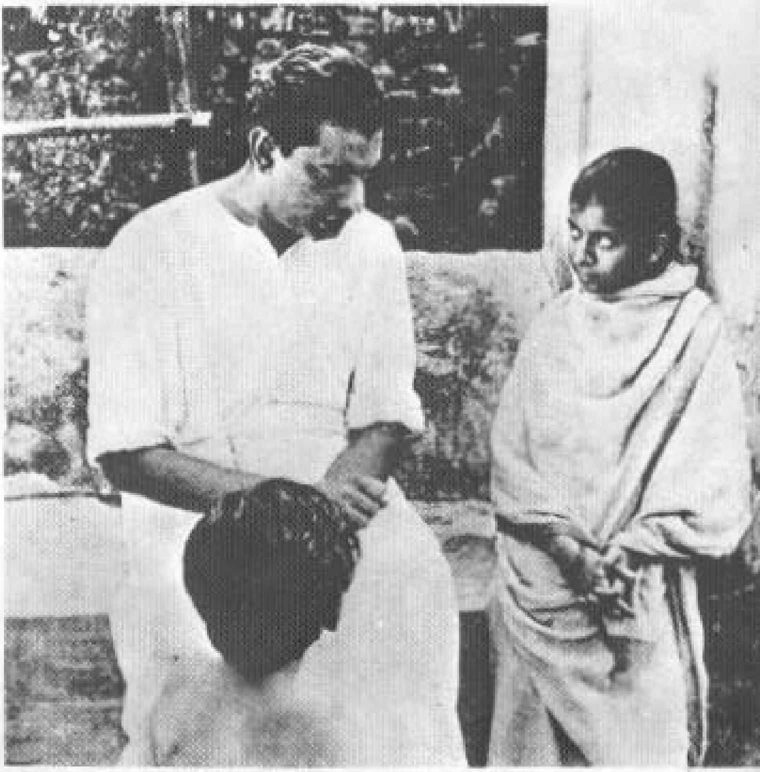

শটের আগে দুজনকে
নিয়ে পরিচালক।

টুলের উপর দাঁড়িয়ে, অতি কষ্টে ক্যামেরায় চোখ লাগাতে চেষ্টা করছে অপু।

হুণ্ডী-ঝুণ্ডী-শুণ্ডী।
সিমলার কাছে বরফে-ঢাকা
কুফরি হয়ে উঠল 'ঝুণ্ডী'—

—তারপর 'হুণ্ডী'।
জয়সলমীর থেকে
কিছু দূরে এক
নাম-না-জানা জায়গা!

অবশেষে 'শুণ্ডী'।
এই দৃশ্য তোলা হয়েছিল
রাজস্থানের বুঁদি শহরের
কাছে।

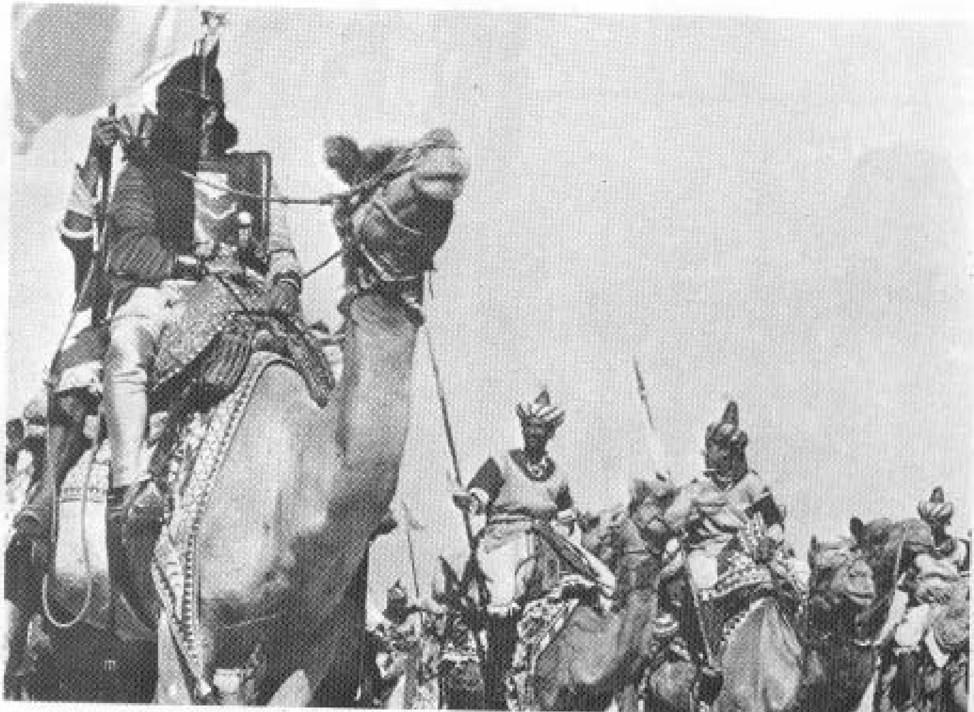

হাল্লারাজার সেনা। সেনাপতি তাঁর উটের পিঠ থেকে হুকুম করলেন—'শুণ্ডী চলো!'

সামনে সৈন্যদল আর দূরে গুপী-বাঘা—'ওরে হাল্লারাজার সেনা, তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল্!'

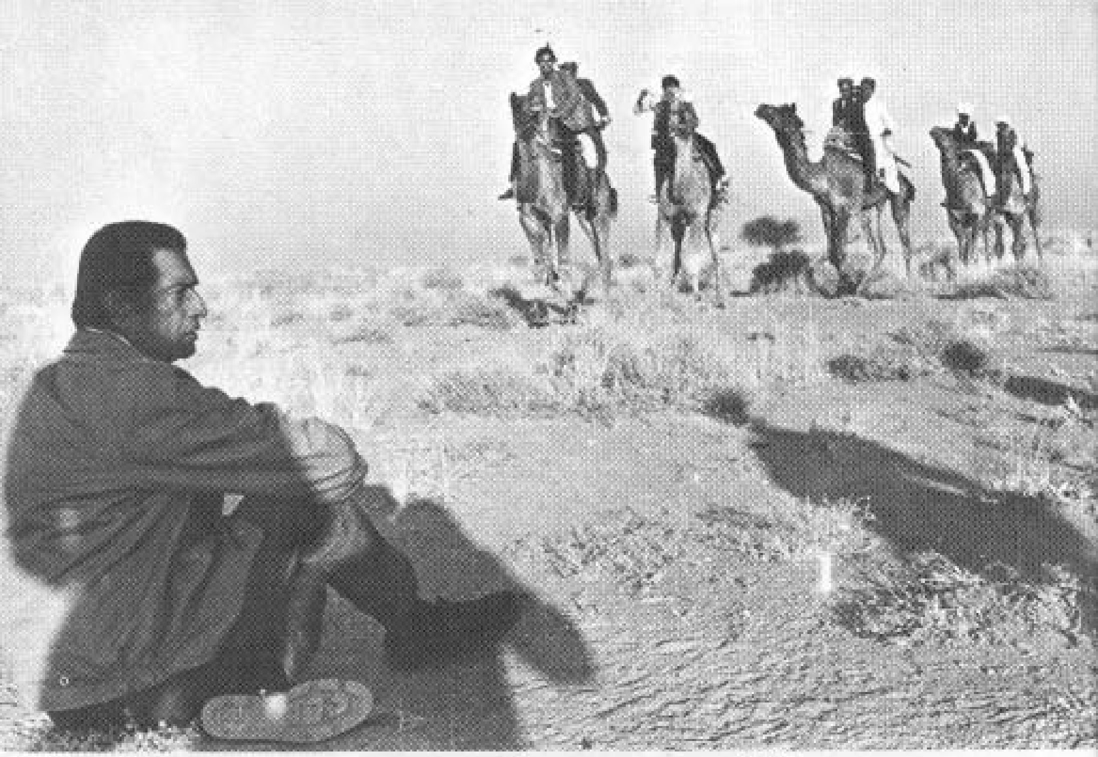

উট বনাম ট্রেন। ক্যামেরা আসার অপেক্ষায় পরিচালক। দূরে সকলে উটে চেপে প্রস্তুত।

উটের পিঠে ফেলু, তোপ্‌সে আর আধমরা জটায়ু!

ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে।
মগনলাল মেঘরাজের
বাড়ির সদর দরজা।

দ্বারভাঙ্গা ঘাট থেকে প্যালেসে ওঠার সিঁড়ি। পাশেই বুরুজে পায়রার ঝাঁক।

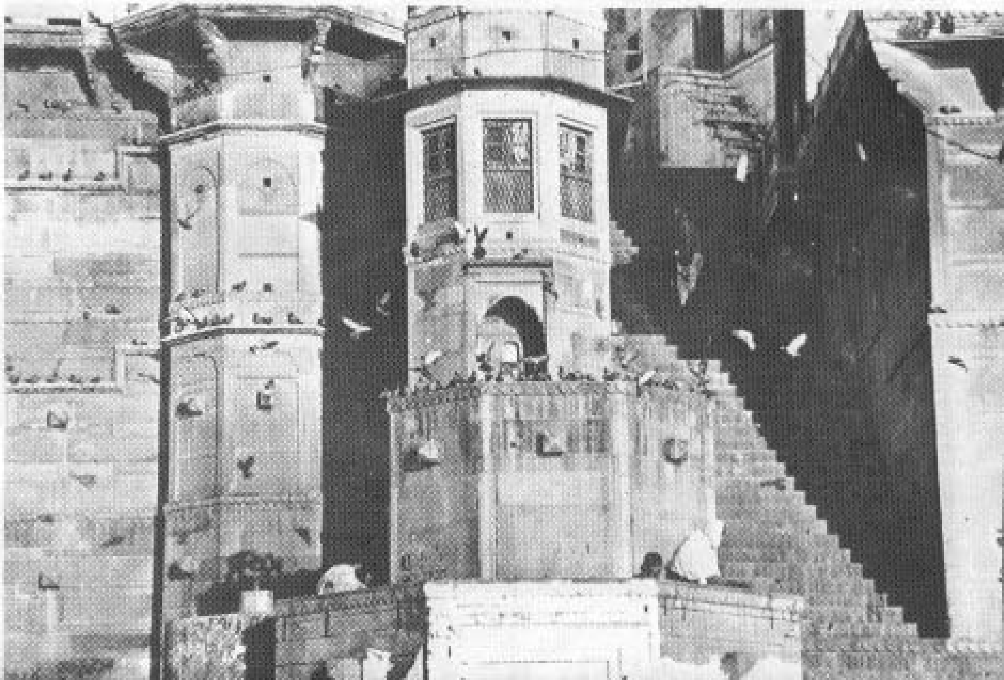

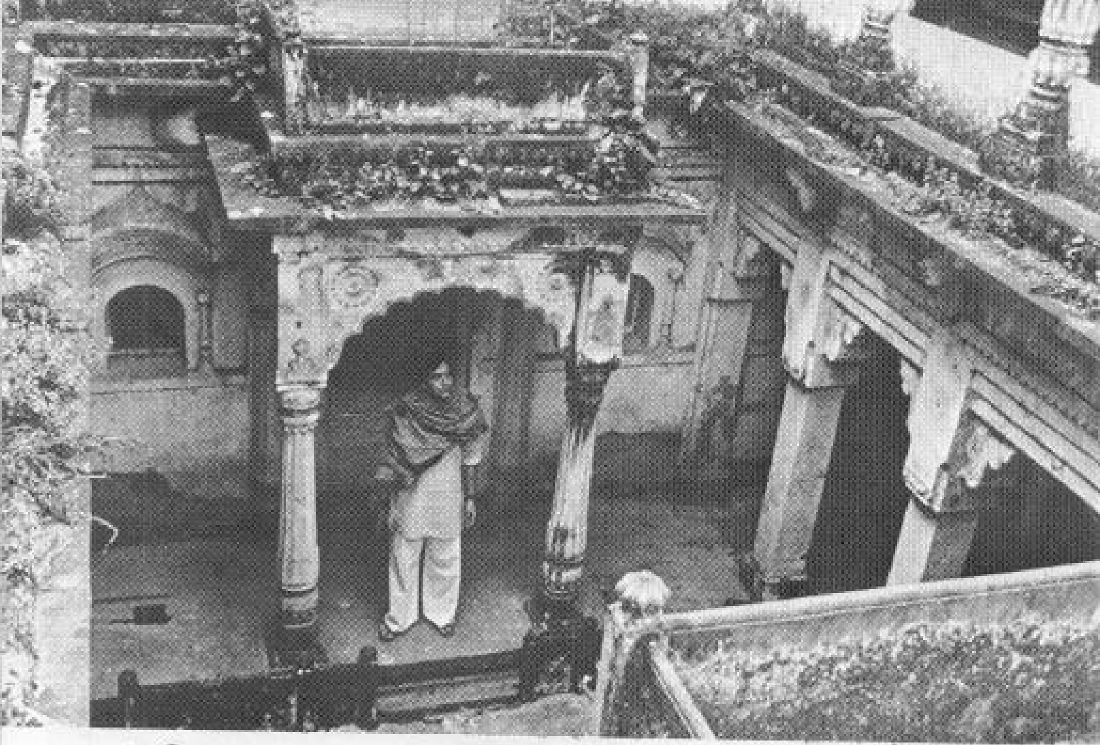

ফেলুদা মছলিবাবার গোপন আস্তানার সন্ধানে পরিত্যক্ত দ্বারভাঙ্গা প্যালেসে ঢুকেছে।

নাগওয়া-তে জ্ঞান চক্রবর্তীর বাড়ি—'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ ঘোষালদের বাড়ি।

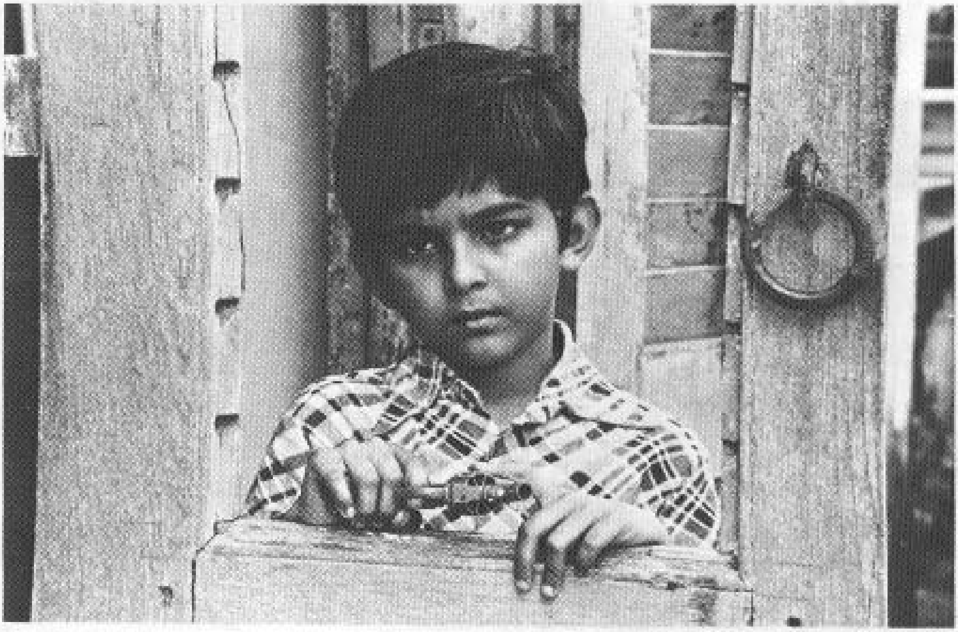

রুকু রিভলভার হাতে তার ছাতের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বারভাঙ্গা ঘাটে শুটিং দেখার জন্য ভিড়।

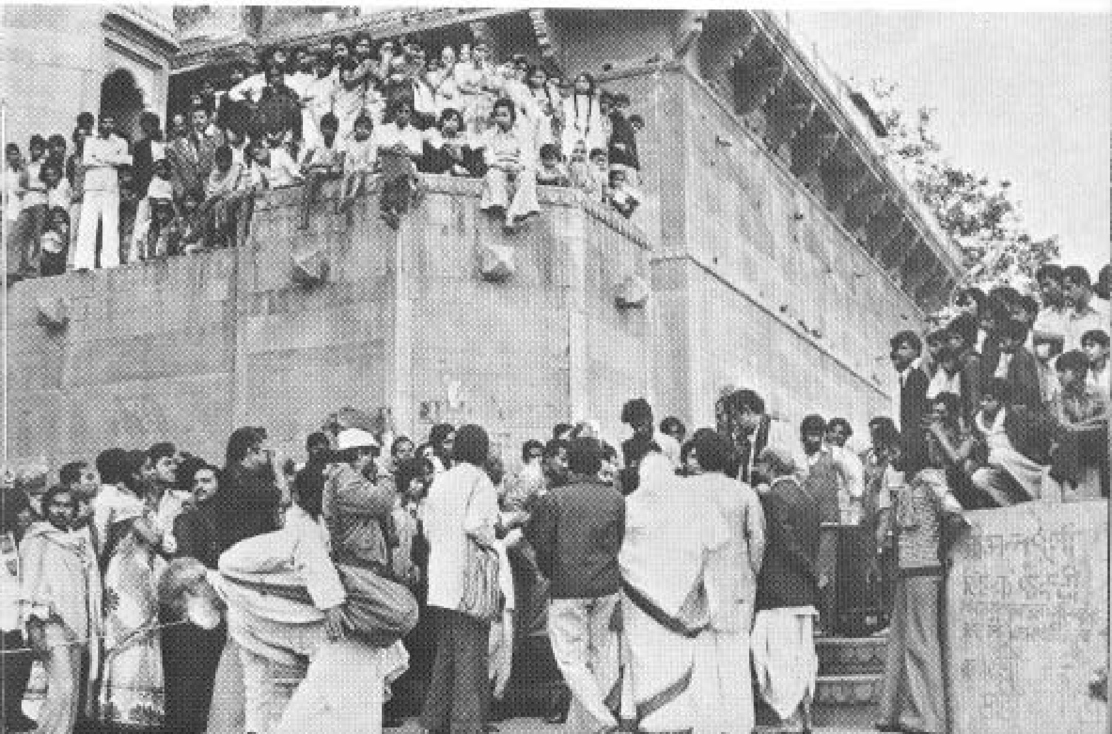

মগনলাল তার বজরায় চড়ে মছলিবাবার কাছে আসছে।

ঘাটে শুটিং-এর পরে সেই বজরা করেই দশাশ্বমেধ ঘাটে ফেরা।

দ্বারভাঙ্গা ঘাটে ছদ্মবেশী তোপ্‌সে আর লালমোহনকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক।

রিক্সাতে লালমোহন আর তোপ্‌সে। গাড়ির ভিতর ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে পরিচালক।

ষাঁড়ের গলিতে ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে।

ফেলু আর তোপ্‌সে দিব্যি বেরিয়ে গেল।

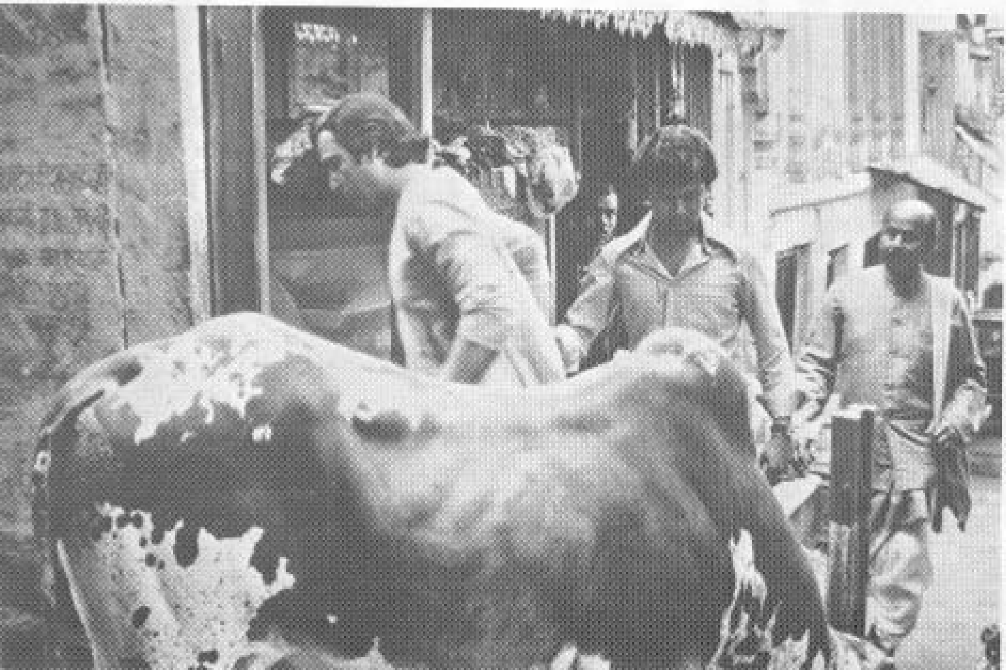

পাঁড়ে হাউলির জনমানবশূন্য থমথমে গলিতে ফেলুদা, তোপ্‌সে আর লালমোহন।

ট্যাক্সির সঙ্গে জোড়া রিক্সাতে চেপে পরিচালক দেখে নিচ্ছেন ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে কি না।

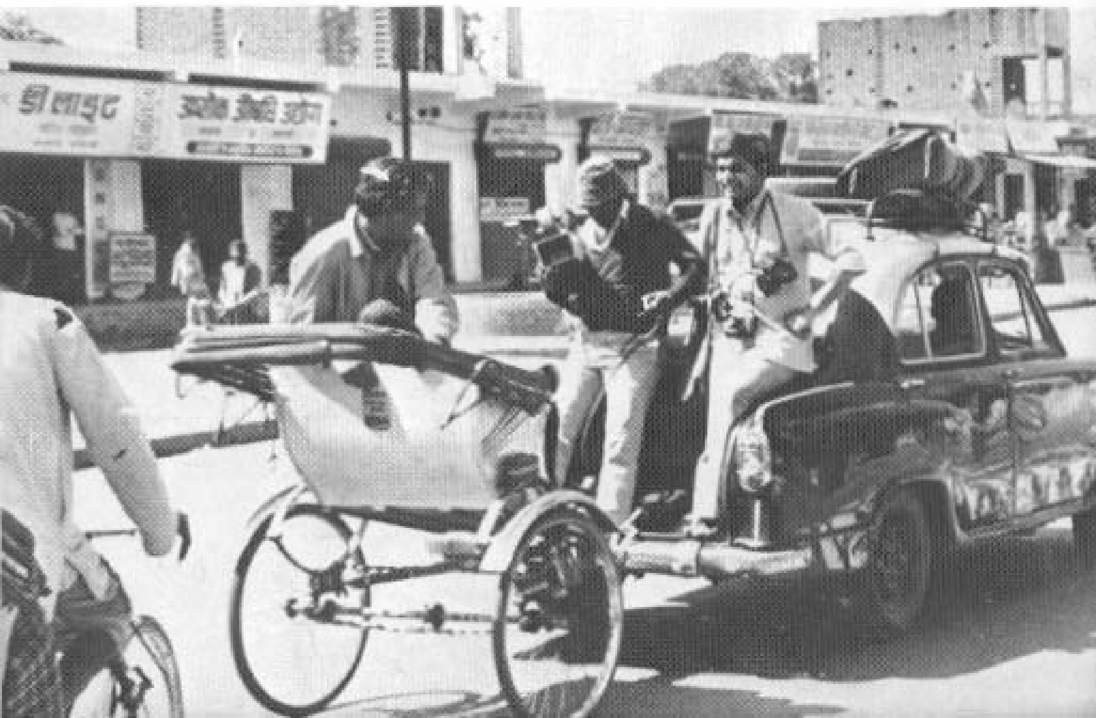

কাশীর ঠঠেরি বাজারের বিখ্যাত মিঠাইয়ের দোকান শ্রীরামভাণ্ডারের সামনে শুটিং।

সেই বাজারের আরেক গলিতে পরের একটি শটের তোড়জোড়। রাস্তায় লাইন পাতা...ট্রলির উপর ক্যামেরা।

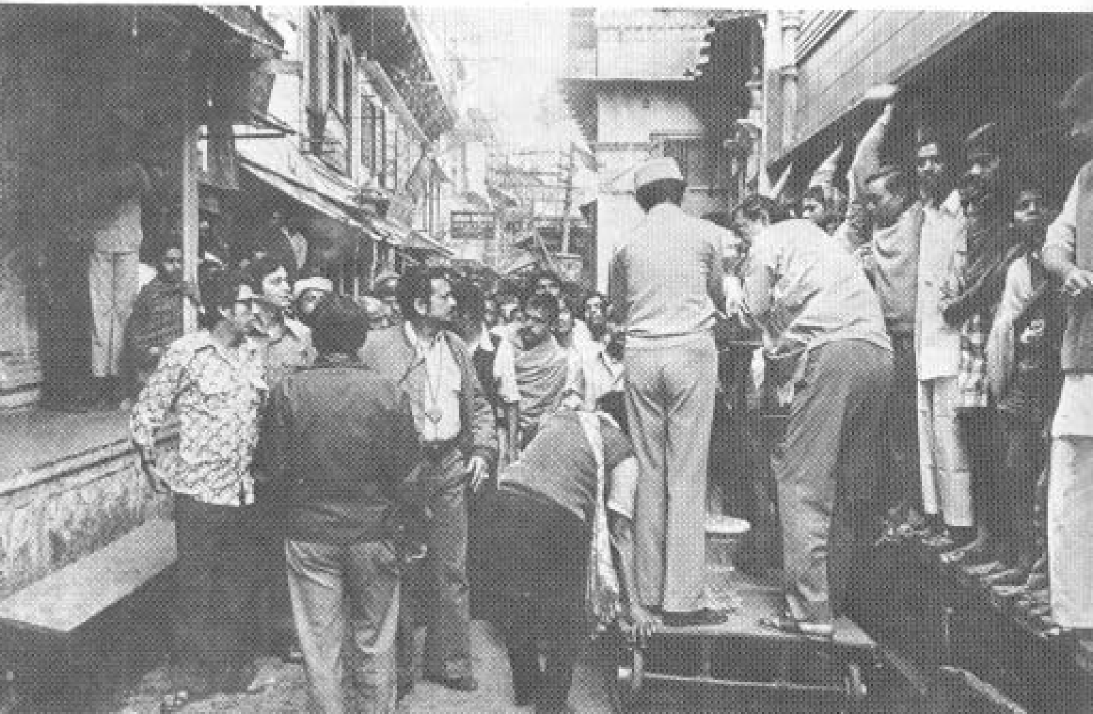

সাইকেল রিক্সাতে ক্যামেরা হাতে পরিচালক।

'তোমার পায় পড়ি বাঘমামা'। সে বাঘ মাঠে নেমেই ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ করে তার বিরক্তি প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

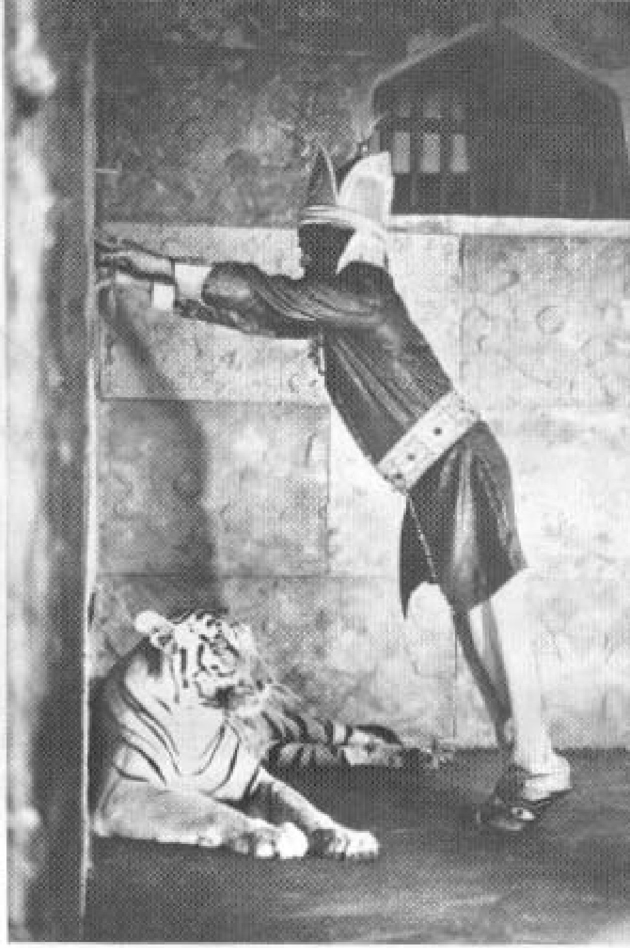

তার শরীরটা বাঘের ওপর দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা, তার হাত দুটো যেন দেওয়ালে আটকে গেছে...

গুপী গান চালিয়ে যায়। পাশে বাঘা, পিছনে বাঘ।

অপুর সঙ্গে আড়াই বছর

পথের পাঁচালী ছবি তোলার কাজ চলেছিল আড়াই বছর ধরে। অবিশ্যি এই আড়াই বছরের রোজই যে শুটিং হয়েছে তা নয়। আমি তখন বিজ্ঞাপনের আপিসে কাজ করি। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকেই শুটিং হত। আর তা অধিকাংশই হত ছুটির দিনে বা আপিসের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে। পয়সাকড়ি বেশি ছিল না আমাদের। যেটুকু জোগাড় হত সেটা ফুরিয়ে গেলে কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে হত যত দিন না আবার কিছু টাকা জোগাড় হয় তার অপেক্ষায়।

শুটিং হবার আগে অভিনয় করার জন্য লোক জোগাড়ের একটা বড় পর্ব ছিল। বিশেষ করে অপুর জন্য কিছুতেই একটি বছর ছয়েকের ছেলে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে বাধ্য হয়ে আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিই।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর একটা বাড়িতে একটা ঘর নিয়েছিলাম ; সেই ঘরে রোজ বিকেলে একটা নির্দিষ্ট সময় সব ছেলে এসে হাজির হত। অনেক ছেলেই এসেছিল, কিন্তু মনের মতো একটিও নয়। একদিন একটি ছেলে এল, তার ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে দেখে আমার কেমন জানি সন্দেহ হল। তার নাম জিগ্যেস করতে ছেলেটি মিহিগলায় বলল, 'টিয়া'। সঙ্গের অভিভাবককে জিগ্যেস করলাম, 'একে কি সদ্য সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে আনলেন নাকি ?' ভদ্রলোক ধরা পড়ে গিয়ে আর আসল ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। বললেন ছেলেটি আসলে মেয়ে, অপুর পার্ট পাবার লোভে তাকে চুল ছাঁটিয়ে এনেছেন আমাদের কাছে।

বিজ্ঞাপন দিয়ে ছেলে না পাওয়ার ফলে আমাদের প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা হয়েছিল। শেষে আমার স্ত্রী একদিন ছাত থেকে নেমে

এসে বললেন, 'পাশের বাড়ির ছাতে একটি ছেলেকে দেখলাম ; তাকে একবার ডেকে পাঠাও তো।' এই পাশের বাড়ির ছেলে শ্রীমান সুবীর ব্যানার্জিই শেষে হল আমাদের অপু। ছবির কাজ যে আড়াই বছর ধরে চলবে সে তো গোড়ায় ভাবা যায়নি, শেষে যত দিন যায় ততই ভয় হয় অপু-দুর্গা যদি বেশি বড় হয়ে যায় তা হলে ছবিতে সেটা ধরা পড়বে। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে এই বয়সে যতটা বাড়ার কথা, দু'জনের একজনও ততটা বাড়েনি। আশি বছরের বুড়ি চুনিবালা দেবী—যিনি ইন্দিরা ঠাকরুন সেজেছিলেন তিনিও যে শুটিং-এর এত ধকল সত্ত্বেও আড়াই বছর বেঁচেছিলেন, সেটাও আমাদের পরম সৌভাগ্য।

শুটিং-এর একেবারে শুরুতেই হল গোলমাল। অপু-দুর্গাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতা থেকে সত্তর মাইল দূরে বর্ধমানের কাছে পালসিট বলে একটা জায়গায়। সেখানে রেললাইনের ধারে কাশফুলে ভরা মাঠ। অপু-দুর্গার প্রথম ট্রেন দেখার দৃশ্য তোলা হবে। বেশ বড় দৃশ্য, তাই একদিনে কাজ শেষ হবে না, অন্তত দু'দিন লাগবে। প্রথম দিন ছিল জগদ্ধাত্রী পুজো। অপু-দুর্গার মধ্যে মন কষাকষি চলেছে, দিদির পিছনে ধাওয়া করে অপু গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে পৌঁছেছে কাশবনে। সকাল থেকে শুরু করে বিকেল অবধি কাজ করে প্রায় অর্ধেক দৃশ্য তোলা হল। পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, খুদে অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই নতুন, সকলেরই একটু বাধোবাধো ঠেকছে। তবে উৎসাহের অভাব নেই কারুর। প্রথম দিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে দিন সাতেক পরে আবার সেই একই জায়গায় ফিরে গিয়ে মনে হল—এ কোথায় এলাম ? কোথায় গেল সব কাশ ? দৃশ্য যে প্রায় চেনাই যায় না ! স্থানীয় লোকের কাছে জানা গেল কাশফুল নাকি গরুর খাদ্য। এই সাত দিনে সব কাশ খেয়ে গেছে তারা। এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে জায়গাটা সেখানে ছবি তুললে আর প্রথম দিনের ছবির সঙ্গে মিলবে না।

এ দৃশ্যের বাকি অংশ তোলা হয়েছিল পরের বছরের শরৎ কালে, যখন আবার নতুন কাশে মাঠ ভরে গেছে। এবার অবিশ্যি ট্রেনের শট্‌ও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ট্রেন নিয়ে এতগুলো শট্ ছিল যে একটা ট্রেনে কাজ হয়নি। পর পর তিনটে ট্রেন ব্যবহার করা হয়েছিল। আগে থেকে টাইম টেব্‌ল দেখে জেনে নেওয়া হয়েছিল সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে ক'টা ট্রেন এই লাইনে আসে। প্রত্যেকটি ট্রেন অবিশ্যি একই দিক থেকে আসা চাই—উলটোমুখি ট্রেন হলে চলবে না। যে স্টেশন থেকে ট্রেন আসবে সেখানে আমাদের দলের অনিলবাবুকে রাখা হয়েছিল। ট্রেন এলে অনিলবাবু উঠে পড়তেন। এঞ্জিনে ড্রাইভারের সঙ্গে। কারণ গাড়ি শুটিং-এর জায়গার কাছাকাছি এলেই বয়লারে কয়লা দেওয়া দরকার, তা না হলে কালো ধোঁয়া বেরোবে না। সাদা কাশ ফুলের পাশে কালো

ধোঁয়া না পেলে দৃশ্য জমবে কেন ?

ফিল্মে যখন দৃশ্যটা দেখা যায় তখন বোঝাই যায় না যে দিনের তিনটে বিভিন্ন সময় তিনটে আলাদা ট্রেন ব্যবহার করা হয়েছে। আজকের ডিজেল-ইলেকট্রিকের যুগে অবিশ্যি এ দৃশ্য এভাবে তোলা যেত না।

পয়সার অভাবে এত বেশি দিন ধরে ছবি তোলার জন্য আরও অনেক সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছিল আমাদের। একটা উদাহরণ দিই।

বইয়ে আছে অপু-দুর্গাদের পোষা কুকুর ভুলোর কথা। গ্রাম থেকেই একটা কুকুর জোগাড় হয়েছিল ; সেটা আমাদের সকলেরই বেশ পোষ মেনে গিয়েছিল। ছবির একটা দৃশ্যে অপুর মা সর্বজয়া অপুকে ভাত খাওয়াচ্ছেন। ভুলো দাওয়ার সামনে উঠোনে বসে খাওয়া দেখছে। অপুর হাতে তীর ধনুক, খাওয়ায় তার বিশেষ মন নেই। সে মার দিকে পিঠ করে বসেছে, কখন আবার তীর ধনুক নিয়ে খেলবে তারই অপেক্ষা।

অপু খেতে খেতেই তীর ছোঁড়ে। তারপর খাওয়া ছেড়ে উঠে যায় তীর আনতে। সর্বজয়া বাঁ হাতে থালা ডান হাতে গ্রাস নিয়ে ছেলের পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু ছেলের ভাব দেখে বোঝে সে আর খাবে না। ভুলোও উঠে পড়েছে। তার লক্ষ ভাতের থালার দিকে।

এর পরের শট্-এ দেখানো হবে সর্বজয়া বাকি ভাতটুকু আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। আর সেটা যায় ভুলোর পেটে। কিন্তু এই শট্টা আর নেওয়া গেল না। দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে আমাদের টাকাও।

মাস ছয়েক পরে টাকা সংগ্রহ হলে পর আবার বোড়াল গ্রামে যাওয়া হয় দৃশ্যের বাকি অংশ তোলার জন্য। কিন্তু গিয়ে জানা গেল ভুলো আর নেই। এই ছ'মাসের মধ্যে সে কুকুর মরে গেছে। কী হবে ?

খবর পাওয়া গেল আর একটা কুকুর আছে অনেকটা ভুলোর মতোই দেখতে। আনো ধরে সে কুকুরকে।

সত্যি তো। দুই কুকুরে আশ্চর্য মিল। গায়ের বাদামি রঙে তো বটেই। সেই সঙ্গে আগেরটার মতো এটারও ল্যাজের ডগা সাদা। শেষ পর্যন্ত এই নকল ভুলোই সর্বজয়ার পিছন পিছন এসে দিব্যি আস্তাকুঁড়ে ফেলা থালার ভাত খেয়ে ফেলল, আর আমাদেরও পুরো দৃশ্যটা তোলা হয়ে গেল। ফিল্ম দেখে ফাঁকি ধরে কার সাধ্যি।

শুধু কুকুর কেন, মানুষকে নিয়েও ঠিক এই মুশকিলে পড়তে হয়েছিল পথের পাঁচালীর শুটিং-এ।

চিনিবাস ময়রার কাছ থেকে মিষ্টি কেনার সামর্থ্য অপু-দুর্গার নেই। তাই ময়রার পিছন ধাওয়া করে তারা যায় মুখুজ্যেদের বাড়িতে। মুখুজ্যেরা বড়লোক, তারা মিষ্টি কিনবেই, আর তাই দেখেই অপু-দুর্গার

আনন্দ।

এই দৃশ্যও খানিক দূর তোলার পর আমাদের শুটিং বেশ কয়েকমাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। টাকা জোগাড় হলে পর আবার যখন আমরা গ্রামে যাব তখন খবর এল যিনি চিনিবাসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি আর এই জগতে নেই। কুকুরে-কুকুরে সামান্য বেমিল ধরা না গেলেও প্রথম চিনিবাসের সঙ্গে মোটামুটি মিল হবে এমন মানুষ পাই কোথায়?

শেষ পর্যন্ত যাঁকে পাওয়া গেল তাঁর মুখে বিশেষ মিল না থাকলেও, দেহটা মোটামুটি আগের চিনিবাসের মতোই নাদুস নুদুস। তাঁকে নিয়েই শট্ নেওয়া হল। ছবিতে দেখা গেল এক নম্বর চিনিবাস বাঁশ বন থেকে বেরোলেন, আর পরের শটেই দু' নম্বর চিনিবাস ক্যামেরার দিকে পিঠ করে মুখুজ্যেদের বাড়ির ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। পথের পাঁচালী ছবি অনেকে একাধিকবার দেখেছে। কিন্তু কেউ কোনওদিন আমাদের ফাঁকি ধরতে পেরেছে বলে শুনিনি।

এই চিনিবাসের দৃশ্যেই একটা ব্যাপারে আমাদের খুব নাজেহাল হতে হয়েছিল। আর সেটা ওই ভুলো কুকুরকে নিয়ে। পুকুরের ওপারে ময়রা দাঁড়িয়ে আছে। আর এপারে বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অপু-দুর্গা তার দিকে চেয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে। ময়রার প্রশ্নের জবাবে তারা জানায়, তাদের মিষ্টির দরকার নেই। ময়রা তখন রওনা দেয় মুখুজ্যেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। দুর্গা অপুকে বলে, 'চ', আমরাও যাই'। ভাই বোনে ছুট দেয়। আর ঠিক তখনই পিছনে গাছতলায় বসা ভুলো একলাফে উঠে ছুট দেয় তাদের সঙ্গে যাবার জন্য।

এই হল দৃশ্য ; কিন্তু মুশকিল হল কী ? এ কুকুর তো আর হলিউডের শেখানো পড়ানো তৈরি কুকুর নয়—কাজেই ঠিক অপু-দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে সেও দৌড় দেবে কিনা এটা বলা ভারি কঠিন। কুকুরের আসল মালিককে বলা আছে, যেই অপু-দুর্গা দৌড় দেবে, তৎক্ষণাৎ ক্যামেরার পিছন থেকে তিনি যেন কুকুরের নাম ধরে ডাক দেন, যাতে সেও দৌড়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল কুকুর ডাকে সাড়া দেয় না। যেমন ছিল তেমনই বসে থাকে। এদিকে ক্যামেরা চলছে, ফিল্মের দাম অনেক, সেই ফিল্ম নষ্ট হচ্ছে, আর আমাকে বার বার বলতে হচ্ছে 'কাট্! কাট্!'

এখানে ধৈর্য ধরা ছাড়া গতি নেই। ঠিক ভাবে ঠিক সময়ে ছুট দিলে ভুলো সত্যি হয়ে যাবে এদের পোষা কুকুর, মিষ্টির প্রতি যার লোভ তার মনিবদের চেয়ে কিছু কম নয়।

এই পয়সার অভাবেই আমাদের বৃষ্টির দৃশ্য তুলতে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়েছিল। বর্ষাকাল এল গেল, অথচ আমাদের হাত খালি বলে শুটিং বন্ধ। শেষটায় যখন পয়সা এল তখন অক্টোবর মাস। শরৎকালে

ঝলমলে দিনে বৃষ্টির আশায় অপু-দুর্গা যন্ত্রপাতি লোকজন নিয়ে রোজ গিয়ে গ্রামে বসে থাকতাম। আকাশে একটুকরো কালো মেঘ দেখলেই হাঁ করে সেদিকে চেয়ে থাকতাম, যদি সেটা জাদুবলে আকাশ ছেয়ে ফেলে বৃষ্টি নামিয়ে দেয়।

শেষে একদিন তাই হল। শরৎকালে ঘনঘটা করে নামল তুমুল বৃষ্টি। তারই মধ্যে দুর্গা বৃষ্টিতে ভিজে দৌড়ে এসে কুলগাছতলায় ভাইয়ের পাশে আশ্রয় নিল। ভাইবোনে জড়াজড়ি করে বসে আছে। দুর্গা বিড়বিড় করছে 'নেবুর পাতা করমচা, হে বৃষ্টি ধরে যা'। শরৎকালের বৃষ্টিতে রীতিমতো ঠাণ্ডা, অপুর খালি গা, অ্যালক্যাথিনের ছাউনিতে ঢাকা ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দেখছি সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। শট্-এর পরে দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি খাইয়ে ভাই বোনের শরীর গরম করা হল। অবিশ্যি দৃশ্যটা যে ভালই হয়েছিল সেটা যারা ছবিটা দেখেছে তারাই জানে।

কাজের পক্ষে কিন্তু গোপালনগরের চেয়ে বোড়াল গ্রামকে আমাদের বেশি উপযোগী বলে মনে হল। অপু-দুর্গার বাড়ি, অপুর পাঠশালা, গ্রামের মাঠঘাট ডোবা পুকুর আমবন বাঁশবন সবই বোড়ালের মধ্যে বা আশেপাশে পাওয়া গিয়েছিল। এখন সে গ্রামে বিজলি এসে গেছে। পাকা বাড়ি পাকা রাস্তা হয়েছে। তখন সেরকম ছিল না।

এই গ্রামে আমাদের বহুদিন ধরে বহুবার যেতে হয়েছে তাই সেখানকার লোকজনের সঙ্গেও যথেষ্ট আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারি অদ্ভুত চরিত্র। এঁকে আমরা সুবোধদা বলে ডাকতাম। বছর ষাট-পঁয়ষট্টি বয়স, মাথায় টাক, একা একটি কুঁড়েঘরে থাকেন আর দাওয়ায় বসে আপন মনে বিড়বিড় করেন। আমরা ফিল্ম তুলতে এসেছি জেনে প্রথম দিকে তিনি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। আমাদের দেখলেই হাঁক দিতেন—'ফিলমের দল এয়েচে—বল্লম নিয়ে লাপিয়ে পড়ো!' খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম এঁর মাথায় ছিট আছে। পরে অবিশ্যি সুবোধদার সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়ে যায়। আমাদের ডেকে দাওয়ায় বসিয়ে বেহালায় যাত্রার গৎ বাজিয়ে শোনাতেন। আর মাঝে মাঝে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলতেন, 'ওই যে দেখছ সাইকেলে যাচ্ছে, ও কে জান তো? ও হল রুজভেল্ট। মহা পাজি।' আর একজন হল চার্চিল, আর একজন হিটলার, আর একজন খান আবদুল গফুর খাঁ। সকলেই পাজি, সকলেই সুবোধদার শত্রু।

আমরা যে বাড়িতে শুটিং করতাম, তার পাশের বাড়িতেই এক ধোপা থাকতেন। তিনিও ছিটগ্রস্ত। তাঁকে নিয়ে আমাদের মুশকিলই হত, কারণ তাঁর বাতিক ছিল হঠাৎ হঠাৎ 'হে বন্ধুগণ' বলে তারপরে দীর্ঘ রাজনৈতিক বক্তৃতা শুরু করা। অন্য সময়ে আপত্তি নেই, কিন্তু শট্-এর মাঝখানে এই বক্তৃতা শুরু হলে আমাদের সাউন্ডের দফারফা হয়ে যাবে।

তাঁর বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে আমাদের সমস্যা সমস্যাই থেকে যেত।

যে বাড়িতে শুটিং হত সেটা আমরা পেয়েছিলাম জীর্ণ জংলা অবস্থায়। বাড়ির মালিক থাকতেন কলকাতায়। তাঁর কাছ থেকে মাসিক ভাড়া দিয়ে বাড়িটা আমরা ব্যবহারের জন্য নিয়ে নিয়েছিলাম। সেটাকে সংস্কার করে আমাদের কাজের উপযোগী করে নিতে আমাদের লেগেছিল প্রায় এক মাস।

বাড়ির একটা অংশে সার বাঁধা পাশাপাশি কয়েকটা ঘর ছিল যেগুলো আমরা ছবিতে দেখাইনি। সেগুলিতে আমাদের মালপত্র রাখা হত। আর একটা ঘরে তাঁর যন্ত্র সমেত বসতেন আমাদের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ভূপেনবাবু। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও, তাঁর গলা শুনতে পেতাম। প্রত্যেকটি শটের পর আমরা হাঁক দিয়ে জিগ্যেস করতাম, 'সাউন্ড ঠিক আছে তো?' ভূপেনবাবু জবাবে হাঁ কি না জানিয়ে দিতেন।

একদিন একটা শট্-এর পর যথারীতি প্রশ্ন করাতে কোনও জবাব পেলাম না। আবার জিগ্যেস করলাম—'সাউন্ড ঠিক আছে তো ভূপেনবাবু?' এবারও কোনও উত্তর না পেয়ে কারণটা জানার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি একটি বিরাট গোখরো সাপ ঘরের পিছন দিকের জানালা দিয়ে ঢুকে মেঝেতে নামছে। সেই সাপ দেখে স্বভাবতই ভূপেনবাবুর কথা বন্ধ হয়ে গেছে!

এই সাপটা আমরা আসার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখেছিলাম। ইচ্ছে সত্ত্বেও স্থানীয় লোকে নিষেধ করাতে সেটাকে মারতে পারিনি। সাপটা নাকি বাস্তুসাপ। বহুদিন থেকেই এই পোড়ো বাড়িতে বসবাস করছে।

বাঘের খেলা

জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ছবি তোলার ব্যাপারে হলিউডকে কেউ টেক্কা দিতে পারবে বলে মনে হয় না। মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরকে নিয়ে পরপর অনেকগুলো ছবি কলকাতায় দেখানো হয়েছিল। কুকুরের নাম ছিল রিন-টিন-টিন। সে কুকুর 'অ্যাকটিং'-এ ছিল মানুষের বাড়া। আরও পরে 'কলি' জাতের একটা কুকুরকে নিয়ে তিন-চারখানা ছবি কলকাতায় আসে। এ কুকুরের নাম ছিল ল্যাসি। ল্যাসিকেও দেখে মনে হত পরিচালক তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নিতে পারেন। এই সব শিক্ষিত কুকুর ছিল এক-একটি নামকরা স্টার, আর তাদের রোজগারও ছিল প্রায় মানুষ-তারকাদের সামিল। এক-একটা ছবি করে হেসে খেলে লাখ টাকা বা তারও বেশি পেয়ে যেতেন কুকুরের মালিকরা।

এই সব কুকুর অভিনেতার খাতির কিরকম সেটা আমি বুঝেছিলাম আজ থেকে বিশ বছর আগে হলিউডের ডিজনি স্টুডিওতে একটা ছবির শুটিং দেখতে গিয়ে। এ ছবির প্রধান চরিত্র ছিল একটি বিরাট লোমশ কুকুর, যাকে আমেরিকায় বলে 'শ্যাগি ডগ'। আমি যখন স্টুডিওতে পৌঁছেছি তখন শুটিং আরম্ভ হয়নি ; ক্যামেরাম্যান আলো সাজাবার তোড়জোড় করছেন। এই আলো সাজানোর সময় অভিনেতার হাজির থাকতে হয়, কারণ তাঁরা পরিচালকের সাহায্যে ক্যামেরাম্যানকে দেখিয়ে দেন এই বিশেষ দৃশ্যে তাঁরা কীভাবে হাঁটাচলা করবেন, কোথায় বসবেন, কোথায় দাঁড়াবেন ইত্যাদি। খুব নামকরা স্টার হলে এ-কাজটা করার জন্য তাঁর বদলে থাকে তাঁর 'স্ট্যান্ড-ইন'। এই স্ট্যান্ড-ইন হল এমন একজন লোক যিনি চেহারায় ও শরীরের গড়নে স্টারের খুব কাছাকাছি। স্টার নিজে আসেন আলো সাজানোর কাজ হয়ে যাবার পর, একেবারে

শট্ নেবার ঠিক আগে।

এখানে দেখলাম একপাশে কিছু অভিনেতা ঘোরাফেরা করছেন, আর আর-একধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন ছবির প্রধান অভিনেতা—সেই বিরাট ধুমশো লোমশ কুকুর। ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে হুকুম আসতেই অভিনেতারা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, কিন্তু কুকুর দিব্যি যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। তা হলে কি কুকুরকে এ শট্-এ দরকার হবে না?

এ প্রশ্নের উত্তর পাবার আগেই হঠাৎ দেখি একটি মাঝবয়সী বেঁটে-বামন কোত্থেকে জানি এসে হাজির হয়েছে, আর তার পিছন পিছন এসেছে একটি লোক যার হাতে রয়েছে একটা লোমশ কুকুরের ছাল। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখলাম বামনটি মেঝেতে একটা খড়ির দাগ দেওয়া জায়গায় চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো উপুড় হয়ে পড়লেন, আর তাঁর পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল সেই কুকুরের ছাল। তারপর পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী সেই ছালপরা বামন হাতের তেলো ও হাঁটুতে ভর করে চলে ফিরে বেড়াতে লাগলেন, আর ক্যামেরাম্যানও তাঁর আলো সাজাতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এই বেঁটে-বামনটি হলেন ওই শ্যাগি-ডগের মাইনে করা স্ট্যান্ড-ইন।

বিদেশি ছবিতে জানোয়ারের কোনও পার্ট থাকলেই বুঝতে হবে, সেগুলো সব রীতিমতো শেখানো পড়ানো বুদ্ধিমান জানোয়ার। ঘোড়া বা কুকুরকে তো বেশ সহজেই এটা-সেটা করতে শেখানো যায়, কিন্তু শিক্ষিত দাঁড়কাকের কথা শুনেছ কখনও? আর একটা-দুটো নয়; একসঙ্গে একেবারে শ'খানেক? এ জিনিসও সম্ভব হয়েছে হলিউডেই। পরিচালক হিচককের নাম হয়তো তোমরা কেউ কেউ শুনেছ; লোমহর্ষক সাসপেন্স ছবি করতে তাঁর জুড়ি আর নেই। বছর দশেক আগে এঁর Birds ছবিতে নানান জাতের অনেকগুলো পাখির দরকার হয়েছিল। গল্পে ছিল সারা পৃথিবীর পাখি হঠাৎ কেন জানি মানুষের উপর ক্ষেপে গিয়ে তাদের আক্রমণ করতে শুরু করছে। নানারকম পাখির মধ্যে সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় দরকার দাঁড়কাকের। সারা যুক্তরাষ্ট্রের কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোল—হিচককের Birds ছবির জন্য শিক্ষিত দাঁড়কাকের প্রয়োজন। যিনি সন্ধান জানেন তিনি অমুক ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞাপন বেরোবার কয়েক দিনের মধ্যেই উত্তর এসে হাজির। জানা গেল অমুক স্টেটের অমুক শহরে একজন লোকের কাছে অনেক শিক্ষিত কাক আছে। ব্যাস—আর কথা নেই। সে লোকও এসে গেল, এবং তার সঙ্গে এসে গেল শ'খানেক শেখানো-পড়ানো দাঁড়কাক। এদের শিক্ষার দৌড় অবিশ্যি খুব বেশি নয়। কিন্তু পঞ্চাশটা কাককে যদি বলা

হয় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সার বেঁধে চুপ করে বোস, আর তারা যদি বলামাত্র আদেশ পালন করে—সেটাই বা কী কম?

এটা না বললেও বোধ হয় চলে যে হলিউডের সুবিধে আমাদের এখানে নেই। বাংলার বাইরে মাদ্রাজে বা বোম্বাইয়ে তবু ঘোড়া হাতি বাঘ ইত্যাদি নিয়ে কিছু ছবি হয়েছে, আর সেগুলো দেখে মনে হয় জানোয়ারগুলো মোটামুটি কথা শোনে। বাংলাদেশে বুদ্ধিমান কুকুর-টুকুর চাইলে পাওয়া যায় জানি; পুলিশেরই কিছু অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে যাদের দিয়ে—একটু ধৈর্য ধরতে পারলে—কিছু কিছু সহজ কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আমরা যখন গ্রামে গিয়ে আমাদের প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' তুলি, তখন একটা স্থানীয় কুকুরকে দিয়ে একটা সামান্য কাজ করাতে কী নাজেহাল হতে হয়েছিল সেটা ভাবলে এখনও ঘাম ছুটে যায়। দৃশ্যটা এই—অপু-দুর্গার বাড়ির সামনে মিষ্টিওয়ালা এসেছে, তার কাঁধে বাঁক থেকে হাঁড়িতে মিষ্টি ঝুলছে। ভাইবোনের মিষ্টি খাবার শখ, কিন্তু পয়সা নেই। কী আর করে; তারা ঠিক করল চিনিবাস ময়রার পিছন পিছন যাবে কোন বাড়িতে কে কী কেনে দেখার জন্য।

আমার মনে হল ব্যাপারটা জমবে যদি ওদের ভুলো কুকুরটাও অপু-দুর্গার পিছু নেয়। ঠিক করলাম প্রথম শট্টা নেওয়া হবে এই ভাবে—অপু-দুর্গা বাড়ির বাইরে পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে চিনিবাসকে দেখছে, পিছনে দেখা যাচ্ছে কুকুরটা একটা পেয়ারাগাছের নীচে বসে আছে। মিষ্টিওয়ালা রওনা দেওয়ামাত্র দুর্গা ছুট দেবে, তার দেখাদেখি অপু ছুটবে, তার পরেই এই দু'জনকে ছুটতে দেখে কুকুরও ছুটবে।

শট্টা নেবার আগে কুকুরের আসল মালিককে ক্যামেরার ডান পাশে পিছন দিকে দাঁড় করিয়ে বলা হল, 'অপু রওনা দেওয়ামাত্র তুমি কুকুরের নাম ধরে হাঁক দেবে। ডাকলে আসবে তো কুকুর?' মালিক একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে দেখুন আপনি আসে কি না।'

একটা রিহার্সাল দেওয়া হল। কুকুর দিব্যি মনিবের ডাক শুনে চট করে উঠে দৌড়ে চলে এল। যাক—আর চিন্তার কোনও কারণ নেই।

শট্ শুরু হল, দুর্গা দৌড়ে বেরিয়ে গেল, অপুও ছুটল দিদির দেখাদেখি, কুকুরের মনিব কুকুরের নাম ধরে ডাক দিলেন—একবার, দু'বার, তিনবার। এ দিকে ঘর ঘর শব্দে ক্যামেরা চলছে, হাজার ফুট ফিল্মের দাম কমপক্ষে দেড়শো টাকা, দশ টাকার ফিল্ম চলে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কুকুর মনিবের ডাকে শুধু একটিবার তাঁর দিকে দৃষ্টি দিয়ে ঘাড়টা আবার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নিল।—কাট্ কাট্ কাট্!

পরিচালক 'কাট্' বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা সুইচ টিপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবারও তাই হল। কুকুরের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যে

কত বড় একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছে সেটা তার মগজে ঢুকছেই না। অথচ শট্‌টা নিতেই হবে। আসলে যদিও অপু দুর্গার সঙ্গে এ কুকুরের কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু এই একটি শট্‌ ঠিকভাবে নিলে, যারা ছবি দেখবে তারা একবারও সন্দেহ করবে না যে এ কুকুর অপু-দুর্গার আদরের ভুলো নয়।

বললে বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু কুকুরবাবাজি সেদিন তার আলিস্যি আর নির্বুদ্ধিতার জন্য একের পর এক এগারোটি শট্‌ পণ্ড করে প্রায় হাজার ফুট ফিল্ম খুইয়ে অবশেষে বারো বারের বার বাজিমাত করলেন।

এর পরের ক'টি শট্‌-এ দেখানো হয়েছিল ময়রার পিছনে অপু, অপুর পিছনে দুর্গা, আর তার পিছনে কুকুর লাইন করে হেঁটে চলেছে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে। যারা ছবি দেখছে তারা কি জানবে যে দুর্গার পিছন দিকে তার মুঠো করা হাতের ভিতর রয়েছে সন্দেশ আর কুকুর চৌকস অভিনেতার মতো শটের পর শট তার পিছনে হেঁটে চলেছে ওই সন্দেশের লোভেই ?

কুকুর তো তবু ম্যানেজ করা গেল, কিন্তু হঠাৎ যদি দেখি যে কোনও দৃশ্যে বাঘের দরকার হয়ে পড়েছে, তখন ? এ সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছিল গুপী গাইন ছবিতে। গুপীকে রাজার আদেশে গাধায় তুলে ঢেঁড়া পিটিয়ে গ্রাম থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে। গুপী সেই গাধার পিঠে চড়ে ঠুক ঠুক করে চলতে চলতে এক বনের ধারে পৌঁছে গেছে। সন্ধ্যা হব হব। গুপীর মনের ভাবটা তার গুনগুনুনি থেকে জানা গেছে—

'সন্ধ্যা হইলে বন বাদাড়ে বাঘে যদি ধ-রে,
গুপী যদি ম-রে।'

গুপী গাধার পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখে বনের ভিতর দিয়েই রাস্তা। বনে ঢুকেই প্রথমে বাঘার সঙ্গে সাক্ষাত, আর তাদের কথাবার্তার ফাঁকেই হঠাৎ ব্যাঘ্রবাবাজির আবির্ভাব। তবে এ বাঘ সোঁদরবনের মানুষখেকো নয়। গুপী-বাঘা যদিও ভয়ে কাঠ, বাঘ কিন্তু এদিক ওদিক পায়চারি করে, তাদের দু'জনকে বিশেষ আমল না দিয়ে আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই চলে যায়।

এ দৃশ্য মাথায় যখন এসেছে তখন তুলতেই হবে ; কাজেই বাঘ চাই। সার্কাসের বাঘ তো শেখানো-পড়ানো বাধ্য বাঘ হয় বলেই জানি, কাজেই সার্কাসেই খোঁজ করা যাক। শহরে তখন সার্কাসের তাঁবু পড়েছে উত্তর কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে। মাদ্রাজি ম্যানেজারের কাছে আগে থেকে লোক পাঠিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গিয়ে হাজির হলাম সার্কাসের তাঁবুতে। টিকিট কিনে সার্কাস ঢের দেখেছি ছোটবেলায়, কিন্তু সকালে যখন সার্কাসের অবসর, তখন তাঁবুর আশেপাশে ঘুরে দেখার সুযোগ

আগে কখনও হয়নি। প্রথমে অবিশ্যি আমরা সোজা গেলাম ম্যানেজারের ঘরে,—থুড়ি, তাঁবুতে। সার্কাসের আসল বড় তাঁবুর তিন দিকে থাকে অনেক ছোট ছোট তাঁবু, আর তাতেই থাকে সার্কাসের লোকজনেরা। ম্যানেজারের তাঁবুটিকে অবিশ্যি ছোট বলা চলে না ; সেখানে টেবিল চেয়ার আলমারি বিছানা কোনওটারই অভাব নেই।

ম্যানেজার আমাদের অভ্যর্থনা করে চেয়ারে বসিয়ে মাদ্রাজি কফি খাওয়ালেন। সে কফি আবার পরিবেশন করল যারা সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ার খেলা ট্র্যাপিজের খেলা দেখাবে সেই সব মেয়েরা। আমরা কী চাইছি সেটা জেনে নিয়ে ম্যানেজার ডেকে পাঠালেন মিস্টার থোরাটকে। ইনিই বাঘের খেলা দেখান। এখন যেটা দেখালেন সেটা হল তাঁর হাতে বাঘের নখের আঁচড়ের পুরনো দাগ। মাদ্রাজি ভদ্রলোক, মজবুত শরীর, একটু নেপালি ধাঁচের চেহারা, বয়স চল্লিশের বেশি নয়। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিতে হল আমরা কী চাইছি। বললাম বীরভূমে সিউড়ির কাছে ছবির শুটিং হচ্ছে ; সেখানে একটা বাঁশবনের মধ্যে আমরা বাঘ চাই। বাঘটা বন থেকে বেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে, সম্ভব হলে একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে, আবার যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকেই চলে যাবে। এ জিনিসটা এই ভারত সার্কাসের বাঘকে দিয়ে করানো সম্ভব হবে কি ? থোরাট মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন, হ্যাঁ হবে। এবার ম্যানেজার জিগ্যেস করলেন ক'দিনের জন্য লাগবে বাঘটা। বললাম কলকাতা থেকে সিউড়ি আসতে যেতে যতটা সময় লাগে—প্লাস আমাদের শুটিং-এর জন্য ঘণ্টা দু'-এক। কথাবার্তায় যা বুঝলাম, বাঘ যাবে লরির পিঠে খাঁচাবন্দি অবস্থায়। যাতায়াত নিয়ে দু'দিনের মামলা। সেই দুটো দিন অবিশ্যি সার্কাসে ওই বিশেষ বাঘের খেলাটি বাদ পড়বে।

থোরাট এবার বললেন, 'আপলোগ আইয়ে। শের দেখ লিজিয়ে।'

এইবারে ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা তাঁবুর পিছন দিকটায় গেলাম। সার্কাসের সঙ্গে যে দিব্যি একটি ছোটখাটো পশুশালা ডেরা বেঁধেছে মার্কাস স্কোয়ারে সেটা বুঝতে পারলাম। সব চেয়ে দর্শনীয় জানোয়ার হচ্ছে একটি জলহস্তী। মাটিতে একটা চৌবাচ্চা খুঁড়ে তাতে জল ভরে জানোয়ারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে। একটা লরির উপর খাঁচার দরজা থেকে মজবুত তক্তা নেমে এসে জলের ধারে পৌঁছেছে। বুঝলাম কলকাতার পাট ফুরোলে হিপোমশাই জল থেকে সোজা তক্তা দিয়ে উঠে খাঁচাবন্দি হয়ে আবার সার্কাস যেখানে যাবে সেখানে গিয়ে হাজির হবেন।

হিপো ছাড়া আছে সিংহ, ভাল্লুক, হাতি, ঘোড়া আর বেশ কয়েক জাতের বাঘ। খাঁচাবন্দি দু'টো রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে দেখিয়ে থোরাট

বললেন যে, তারই মধ্যে একটাকে নিয়ে তিনি সিউড়ি গিয়ে হাজির হবেন নির্দিষ্ট দিনে। এবার আমি একটা প্রশ্ন করলাম—

'বাঘটাকে খাঁচা থেকে নামিয়ে বাঁশবনে ছেড়ে দেওয়া যাবে তো ?'

মিঃ থোরাট কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ওকে ওভাবে তো কোনও দিন ছাড়িনি, তাই ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।'

সর্বনাশ !—ভেস্তে গেল বুঝি আমাদের সব প্ল্যান। বাঘের সঙ্গে সঙ্গে তার ট্রেনার আবির্ভূত হবেন নাকি বাঁশবনে ? আর তাই দেখে গুপী-বাঘা ভয়ে কাঠ হয়ে যাবে ? তা তো হয় না !

মিস্টার থোরাটই এবার আর একটা আইডিয়া দিলেন। 'বাঘের গলায় তার বেঁধে দেব। সরু অথচ মজবুত তার।'

'অনেকখানি লম্বা হওয়া চাই সে তার।'

'তা হবে। তারের অন্য দিক বাঁধা থাকবে মাটিতে পোঁতা লোহার খুঁটির সঙ্গে।'

তার যথেষ্ট সরু হলে হয়তো ক্যামেরায় ধরা পড়বে না, তাই এ প্রস্তাবে আপত্তি করলাম না। কিন্তু একটা মুশকিল। বাঘের গলায় তার জড়ালে গলার লোম চেপে বসে যাবে। তার ফলে ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। একটু ভাবতেই মাথায় একটা ফন্দি এল, সেটা থোরাটকে বললাম।

'বাঘের চামড়া দিয়ে একটা বকলস তৈরি করে সেটাকে বাঘের গলায় বেঁধে তার সঙ্গে তারটা আটকানো যায় না ?'

থোরাট বললেন, সেটা সম্ভব। মিনিট দশেকের মধ্যে সব কথাবার্তা হয়ে গেল। সিউড়িতে পৌঁছানোর তারিখটা বাতলে দিয়ে কিছু আগাম টাকা দিয়ে দেওয়া হল মিঃ থোরাটকে। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও ঝঞ্ঝাট হবে না।' ম্যানেজারকে থ্যাঙ্ক ইউ ও গুডবাই জানাবার পর ভদ্রলোক শুধু একটি অনুরোধ করলেন ভারত সার্কাসের নামটা যেন আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকারের তালিকায় দিয়ে দিই।

সিউড়ি ও রামপুরহাটের কাছাকাছি অনেকগুলো জায়গায় শুটিং হয়েছিল গুপী গাইনের। নতুন গাঁ নামে একটা গ্রামকে করা হয়েছিল গুপীর গ্রাম। সেখান থেকে মাইল পনেরো দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে একটা বাঁশবন বাছা হয়েছিল গুপী বাঘার প্রথম সাক্ষাত, আর বাঘের দৃশ্যটা তোলার জন্য। প্রথম দৃশ্যটা তোলা হয় বাঘ এসে পৌঁছানোর আগেই। নির্দিষ্ট দিনে খবর এসে গেল যে কলকাতা থেকে সন্ধ্যাবেলা রওনা হয়ে পরদিন সকালে বাঘ ও থোরাট সমেত লরি এসে পৌঁছে গেছে শুটিং-এর জায়গার কাছে। আমরা খবর পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে পৌঁছে গেলাম সেখানে। আমাদের দলে ছিল সবশুদ্ধ জনা পঁচিশেক লোক। তা ছাড়া স্থানীয় কিছু লোক শুটিং হবে জেনে আমাদের অনুমতি

নিয়ে হাজির হয়েছিল বাঁশবনের ধারে।

লরির উপর খাঁচা, খাঁচার উপর ছাউনি। আমরা যেতে ছাউনি খুলে ফেললেন মিঃ থোরাট। ওমা, এ যে দেখছি একটার জায়গায় দু'টো বাঘই এসে হাজির হয়েছে! কী ব্যাপার ? থোরাট বললেন, যেটা বাছাই করা হয়েছিল সেটা যদি কোনও গোলমাল করে তাই অন্যটিকে আনা হয়েছে। কথাটা শুনে মোটেই ভাল লাগল না। দ্বিতীয়টিও যদি গোলমাল করে তা হলে কী হবে সেটা জিগ্যেস করার আর ভরসা পেলাম না। থোরাটকে বললাম, ক্যামেরা রেডি হলে পর জানাব, তারপর যেন বাঘ বার করা হয়। এর আগে মফঃস্বলের সার্কাসের বাঘের নমুনা দেখেছি ; সে সব বাঘকে দেখলে কষ্ট হয়। ছোট একটা খাঁচার মধ্যে জ্বোরো রুগীর মতো বসে ধুঁকছে, তাদের দিয়ে যে কী করে খেলা দেখানো হয় তা মাথায় আসে না। কিন্তু ভারত সার্কাসের দু'টো বাঘই দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান।

তেপায়া স্ট্যান্ডের উপর ক্যামেরা খাড়া করে বনের যে অংশটায় বাঘ দেখা যাবে সেই দিকে মুখ করে থোরাটকে খবর দেওয়া হল। যারা শুটিং দেখতে এসেছিল তাদের ক্যামেরার পিছন দিকে একটু দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমাদের পিছনোর উপায় নেই, গুপী বাঘাকেও থাকতে হবে ক্যামেরার সামনে হাত পাঁচেক দূরে, কারণ বাঘ ও গুপী-বাঘাকে অন্তত একবার একই শট্-এ একসঙ্গে না দেখালে দৃশ্য জমবে না।

ইতিমধ্যে বাঘ যেখানে এসে ঘোরাফেরা করবে তার হাত বিশেক ডান দিকে থোরাটের দু'জন সহকারীর একজন একটি পাঁচ ফুট লম্বা মজবুত লোহার শিক মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। শিকের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ মাটির নীচে, বাইরে বেরিয়ে আছে দু' ভাগ।

তারপর লম্বা লোহার তারের একটা দিক শিকের সঙ্গে বেঁধে অন্য দিকটা থোরাট সাহেবের প্রিয় বাঘের গলায় পরানো বাঘছালের বকলসে লাগিয়ে দেওয়া হল।

আমরা রেডি। খাঁচার হুড়কো টেনে খুলে ফেলা হল। দু'-একবার ডাক দিতেই বাঘবাবাজি খাঁচা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন খোলা জমিতে। তারপর যে ব্যাপারটা হল সেটা আমাদের সকলের কাছেই একেবারে ষোলো আনা অপ্রত্যাশিত। থোরাটও যে এটা আশা করেনি সেটা তার হতচকিত হিমসিম ভাব দেখেই বুঝতে পারছিলাম। বাঘ খাঁচা থেকে নেমেই প্রচণ্ড উল্লাসে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে, আর থোরাটমশাই হাতে ধরা তারের টানে একবার এদিকে একবার ওদিকে হেঁচড়ে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে যে কোনও মুহূর্তে ধরাশায়ী হয়ে পড়বেন।

আর আমরা ? আমরা যে কী করব তা বুঝতে পারছি না। এও একরকম পড়ে পাওয়া সার্কাস আর কি! কিন্তু আমরা তো সার্কাস

দেখতে আসিনি! তিন ঠ্যাঙের উপর ক্যামেরাটা অকেজো হয়ে বোকার মতো বনের দিকে চেয়ে আছে, যে দিকে যাবার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না বাঘের মধ্যে।

মিনিট পাঁচেক লম্ফঝম্পের পর বাঘ খানিকটা শান্ত হলেন। থোরাট এবং তাঁর দুই সহকর্মীর চেহারা দেখবার মতো। এরই ফাঁকে থোরাট ফ্যাকাশে মুখে কোনও রকমে বুঝিয়ে দিলেন, এ বাঘ নাকি সার্কাসে জন্মেছে, খাঁচার বাইরে কোনও দিন যায়নি, বোধহয় এখানে এসে তার স্বাভাবিক বাসস্থানের আমেজ পেয়েই তার মনে এত স্ফূর্তি জেগে উঠেছে।

বাঘ ঠাণ্ডা হবার পর শট্ তো নেওয়া হল, কিন্তু তারপর আর এক কাণ্ড। খাঁচার খোলা দরজার সামনে মাটিতে টুল রাখা হয়েছে, থোরাট হুকুম করলেই বাঘ লাফ দিয়ে মাটি থেকে টুলে, টুল থেকে খাঁচায় ঢুকে যাবে, থোরাটের ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ বাঘের দিক থেকে খাঁচায় ফিরে যাবার কোনও আগ্রহই প্রকাশ পাচ্ছে না। তার বদলে তিনি একটি বাঁশঝাড়ের নীচে বসে একটি কচি বাঁশের ডগা চিবিয়ে খাওয়া যায় কিনা সেটাই একমনে পরখ করে দেখছেন।

থোরাটের হাবভাবে বুঝলাম সে এরকম সমস্যার সামনে কখনও পড়েনি। এর মধ্যে আমাদের সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে। যে বাঘ বাঁশ চিবিয়ে খায়, সে আর যাই হোক মানুষখেকো নয় নিশ্চয়ই। ক্যামেরাতে কিছু ফিল্ম বাকি ছিল, সেটাকে বাঘের একদম কাছে নিয়ে গিয়ে তার এই অদ্ভুত অব্যাঘ্রোচিত কাণ্ডকারখানার কিছুটা ছবি তুলে রাখছি, এমন সময় কী এক আশ্চর্য খেয়ালে সকলকে চমকে ধাঁধিয়ে দিয়ে দুই লাফে বুলেটের মতো তার খাঁচার ভিতর ঢুকে গেল। বাঁশঝাড় থেকে লরি পর্যন্ত এই হাত চল্লিশেক দূরত্ব পেরোতে তার সময় লেগেছিল খুব বেশি তো আধ সেকেন্ড।

কিন্তু বাঘ খাঁচায় ঢুকে গেলেও তার সঙ্গে যে আমাদের সম্পর্ক চুকে যায়নি সেটা বুঝতে পারলাম সিউড়ির শুটিং শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসে কয়েক দিনের মধ্যেই। বাঁশবনের দৃশ্য প্রিন্ট করে দেখা গেল যে, ক্যামেরার গণ্ডগোলে সমস্ত কাজটাই পণ্ড হয়ে গেছে, শট্গুলো বেশি কালো হয়ে যাওয়াতে বাঘ আর বন মিশে একাকার হয়ে গেছে।

তা হলে কি বাঘের দৃশ্য গুপী গাইন ছবি থেকে বাদ যাবে? মোটেই না। ভারত সার্কাস এখনও আছে। আর, এবার সে বাঘকে অত দূরে যেতে হবে না, কারণ কলকাতার কাছেই বোড়াল গ্রামে ভাল বাঁশবন আছে, সে বাঁশবন আমাদের চেনা, সেখানে বিশ বছর আগে অপু দুর্গা আর ইন্দির ঠাকরুণকে নিয়ে শুটিং করেছি। এবার তার বদলে কাজ করবে গুপী, বাঘা, আর ব্যাঘ্রমশাই।

আবার লরি এল, থোরাট এল, বাঘ এল, ইস্পাতের তার বকলস, লোহার খুঁটি এল। আর সেই সঙ্গে এল সার্কাসের শুটিং দেখতে গ্রামসুদ্ধ ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি সবাই। গতবারের বেয়াড়া ঘটনার কথা তখনও আমাদের মনে টাটকা, তাই গ্রামের লোককে বুঝিয়ে বলা হল—বেশি কাছে আসবেন না, অন্তত হাত পঞ্চাশেক দূরে থাকুন, যা দেখবার পরে ছবিতে দেখতে পাবেন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? ভিড় এগিয়ে একেবারে ক্যামেরার ধারে চলে এল। এদিকে থোরাট তৈরি, এবার খাঁচার দরজা খোলা হবে। আমরাও ক্যামেরা নিয়ে তৈরি, গুপী বাঘাও তাদের জায়গায় রেডি।

ঘটাং শব্দে খাঁচার দরজা খুলতেই এবার যেটা হল সে রকম ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছে কি না জানি না। বাঘ লাফিয়ে বেরিয়ে একটা হুঙ্কার দিয়ে তীরবেগে চার্জ করল সোজা সেই গ্রামের দেড়শো দর্শকদের লক্ষ্য করে। বীরভূমের জঙ্গলে দেখেছিলাম ম্যাজিকের মতো বাঘ এই আছে এই নেই, আর এখানে দেখলাম দেড়শো ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি এই আছে এই নেই! বাঘ অবিশ্যি কলারে টান পড়ার জন্য গ্রামের লোক অবধি পৌঁছাতে পারেনি; কিন্তু সেটা আর আগে থেকে কে বুঝবে? এরকম পরিত্রাহি পিট্টান, আর তারপরে ওই অত লোকের একসঙ্গে ফ্যাকাশে মুখে থরহরি কম্প—এ কোনও দিন ভুলব না।

আশ্চর্য, ওই এক আস্ফালনের পরেই কিন্তু বাঘ একেবারে ঠাণ্ডা। দিব্যি সুবোধ বালকের মতো থোরাটের ইশারা মেনে আমাদের বাছাইকরা জায়গায় এসে এদিক ওদিক দেখে সে আবার হেলতে দুলতে থোরাটের কাছেই ফিরে গেল। আর আমার ক্যামেরাও যে এবার কোনও গণ্ডগোল করেনি সেটা দু'দিন পরে পর্দায় ছবি দেখেই বুঝেছিলাম।

হুণ্ডী-ঝুণ্ডী-শুণ্ডী

গুপী-বাঘা ভূতের রাজার কাছ থেকে বর পেয়ে নদীর ধারে বসে ভরপেট খেয়ে সবে হাত মুখ ধুয়েছে, এমন সময় এক বাহারের ডুলিতে চড়ে কোথাকার কোন এক গানের ওস্তাদ সঙ্গে বাজনদার পেয়াদা বরকন্দাজ নিয়ে গলা সাধতে সাধতে তাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। কোথায় যাচ্ছে তারা ? গুপী বাঘা জিগ্যেস করে জানে—শুণ্ডী। কারণ সেখানে রাজবাড়িতে গানের বাজি হবে, ওস্তাদমশাই তাতে যোগ দেবেন।

দল চলে যাবার খানিকক্ষণের মধ্যেই গুপী-বাঘার খেয়াল হল—তা হলে আমরাই বা গানের বাজিতে যোগ দেব না কেন ? আমরা তো গান বাজনা জানি ; যদি বাজি জিতি তা হলে রাজা হয়তো আমাদের সভাগায়ক করে রেখে দেবেন। বরের জোরে যে কোনও জায়গার নাম করে দু'জনে এ-ওর হাতে তালি মারলেই তো হুশ করে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়।

তা যায় ঠিকই, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কী, ওস্তাদের গানের ঠেলায় জায়গার নামটা দু'জনের কারুর কানেই ঠিক করে ঢোকেনি ; বা ঢুকলেও এরই মধ্যে তারা সে নামটা ভুলে বসে আছে। গুপী বলে 'ঝুণ্ডী', বাঘা বলে 'হুণ্ডী'। তা হলে কোন জায়গার নাম করে তালি দেবে তারা ? ঠিক হল গুপীর কথামতো প্রথম ঝুণ্ডীতেই যাওয়া যাক।

যারা গুপী গাইন ফিল্মটা দেখেছে তাদের হয়তো মনে থাকবে এর পরের ঘটনা। এবার ঝুণ্ডী বলে তালি দিতেই চোখের নিমেষে তারা হাজির হল বরফের দেশে। হু-হু কাঁপুনির মধ্যে আবার হাততালি দিয়ে গরম পোশাক আনতে হল। সেই পোশাক পরে দু'জনের লেগে গেল

ঝগড়া। বাঘার ধমকের চোটে শেষটায় গুপী বলে 'চলো তা হলে হুণ্ডীই চলো'।

ওমা, এবারে তালির ফলে তারা পৌঁছল একেবারে ধু ধু মরুভূমির মধ্যিখানে। বরফের দেশের পোশাক তখন গায়ে আগুন ছুটিয়ে দিচ্ছে—দু'জনে সেগুলো গা থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দেয়। আর গুপী বাঘাকে গাল দিতে গিয়ে হঠাৎ দু'জনেরই একসঙ্গে মনে পড়ে যায় শুণ্ডী নামটা।

প্রথম হাততালি থেকে শুণ্ডী নাম মনে পড়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা ফিল্মে দেখতে লাগে তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিট। এই তিন সাড়ে তিন মিনিটের দৃশ্য তুলতে আমাদের কত হাঙ্গামা করতে হয়েছিল সেটাই আজ তোমাদের বলব।

প্রথমে বলে রাখি গুপী গাইনের প্রথম দিকের দৃশ্য তোলা হয়েছিল বীরভূমের রামপুরহাট থেকে বিশ মাইল দূরে একটা গ্রামে। তার নাম নতুন গ্রাম। গুপী বাঘার প্রথম ভোজ, ডুলিতে ওস্তাদ যাবার দৃশ্য, আর 'ঝুণ্ডী' বলে প্রথম হাততালি—সবই এই গ্রামের এক নদীর ধারে তোলা হয়েছিল।

হাতে তালি দেবার পরেই দেখা যায় গুপী বাঘা শূন্যে উঠে গেল। এই ব্যাপারটা করতে অবিশ্যি একটা কারসাজির প্রয়োজন হয়েছিল। একটা আট ফুট বাঁশের মাচা তৈরি করে ক্যামেরাটাকে তার নীচে বসানো হয়, তারপর গুপী-বাঘাকে মই দিয়ে মাচায় তুলে বলা হয় ঠিক ক্যামেরার সামনে বালির উপর লাফিয়ে পড়তে। এই ব্যাপারটার ছবি তোলার সময় ক্যামেরার মধ্যে ফিল্ম চলবে উল্টো দিকে—সে ব্যবস্থাও আগেই করে রাখা হয়েছে। এই উল্টো-তোলা ছবি সোজা ভাবে চালালেই পর্দায় সেটা আবার উল্টে গিয়ে হয়ে যাবে গুপী বাঘা উপর থেকে নীচে না নেমে, নীচ থেকে হুশ্ করে উপরে উঠছে।

এর পরেই দর্শক দেখবে দৃশ্য একেবারে পাল্টে গেছে। কোথায় বাংলার গ্রাম !—মাঠ ঘাট ঘাস নদী গাছ বালি সব উধাও। তার জায়গায় খালি বরফ আর বরফ। এই বরফের দৃশ্য কোথায় তোলা হবে সেটাই এখন ঠিক করা দরকার। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ফেব্রুয়ারি মাসে সিমলায় বরফ থাকে। আর সিমলা থেকে আট মাইল দূরে আরও এক হাজার ফুট উপরে এমন জায়গা আছে যেখানে শুধুই বরফ, ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। এই জায়গার নাম নাকি কুফরি। এই কুফরিতেই ছবি তোলা হবে স্থির করে আমরা দল নিয়ে ট্রেনে করে হাজার মাইলের পাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম। কিছু লোক দিল্লিতে রয়ে গেল, কারণ আমরা সিমলা থেকে দিল্লি হয়ে যাব রাজস্থানে। সেখানে শুণ্ডী আর হাল্লার দৃশ্য তোলা হবে। সিমলা যাবার দলে গুপী বাঘা সমেত সবশুদ্ধ জন দশেক

লোক।

আমি সিমলা আগেও গিয়েছি একবার গরমের সময়। এবারে শহরটাকে দেখে চেনা মুশকিল। মনে হয় সমস্ত শহরের গায়ে শ্বেতী হয়েছে। রাস্তার উপর, ঘর বাড়ির ছাতে, পাহাড়ের গায়ে, পাইন গাছের ডালে পুরু বরফ জমে আছে। পথের বরফ গলে পিছল হয়ে আছে, হাঁটতে গেলে সাবধানে পা ফেলতে হয়।

আমাদের হাতে সময় কম, তাই দুপুরের খাওয়া সেরে তিনটে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কুফরির উদ্দেশে। প্রথম কাজ হল কোথায় শুটিং হবে সেই জায়গা খুঁজে বার করা। মনের মতো জায়গা বাছাই করে কাল আবার আসতে হবে শুটিং-এর লটবহর সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে ক্যামেরা তো থাকবেই, তা ছাড়া থাকবে আট ফুট উঁচু মাচা—যদিও এ মাচা বাঁশের নয়, ইস্পাতের। এখানেও গুপী বাঘাকে হাততালি দিয়ে শূন্যে নিতে হবে—তাই মাচা ছাড়া গতি নেই।

মাত্র আট মাইল পথ, কিন্তু যেতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। পাহাড়ের গা ঘেঁসে এঁকে বেঁকে চলা পুরো রাস্তাটাই বরফে ঢাকা। প্রায় আট দশ ইঞ্চি পুরু বরফ, তাতে খাদ কেটে গাড়ির চাকা এগিয়ে এগিয়ে চলেছে। গলা বরফে চাকা মাঝে মাঝে এগোতে চায় না, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে বরফ ছিটিয়ে বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে।

পথে মেঘ করেছিল, ফলে ঠাণ্ডাও বেড়েছিল বেশ, কিন্তু কুফরি পৌঁছনোর অল্পক্ষণের মধ্যেই রোদ উঠল। কুফরি আসলে একটি গ্রাম, কিন্তু এখানে শীতকালে বহু লোক ski-ing করতে আসে। তাদের জন্য সরকার একটি ক্লাব, একটি বাংলো, আর একটি রেস্ট হাউস তৈরি করে দিয়েছেন। আমাদের এ সবের দরকার নেই, তাই আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের কল্পনায় যে বরফের রাজ্য রয়েছে, তার সন্ধানে। রাস্তার ধারেই জায়গা পেতে হবে, কারণ দুর্গম জায়গা হলে সেখানে শুটিং-এর মালপত্র নিয়ে পৌঁছনো মুশকিল হবে।

আরও শ'দু-এক ফুট উপরে উঠতেই এমন একটি জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে তিন দিক একেবারে খোলা, চোখ ঘোরালে স্তরের পর স্তর বরফে ঢাকা পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আমাদের ডাইনে রাস্তার ঠিক পাশ দিয়েই উঠে গেছে তুষারাবৃত পাহাড়ের গা। আমরা গাড়ি থামিয়ে বাইরে বেরোলাম, আর বেরিয়েই বুঝলাম যে, চারিদিকে বরফ সত্ত্বেও ঠাণ্ডা বেশি লাগছে না। বিশেষতঃ রোদ যখন উঠল তখন তো দিব্যি আরামই লাগছিল।

এই রোদের মধ্যেই আবার হঠাৎ বরফ পড়া শুরু হল। মিহি পাউডারের মতো বরফ আকাশ থেকে হেলে দুলে নেমে আসছে, হাত পাতলে হাতের তেলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাদা হয়ে যায়। বরফ

পড়ায় কোনও শব্দ নেই বলেই যেন ব্যাপারটা ভারি রহস্যময় মনে হয়। তা ছাড়া আকাশে মেঘ নেই অথচ আকাশ থেকে কিছু পড়ছে ভাবতেও অবাক লাগছে।

এই মিহিদানা তুষার বরফের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে এক জায়গায় লক্ষ করলাম রাস্তা থেকে হাত দশেক উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা স্বাভাবিক প্ল্যাটফর্ম গোছের জায়গা হয়ে আছে, সেখানে গুপী বাঘা বেশ স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারবে। তখনই ঠিক করলাম যে, তালির জোরে বাংলাদেশের গ্রাম থেকে সটান ওখানেই এসে হাজির হবে তারা। চারিদিক চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম যে, কাছাকাছির মধ্যে কেবল বরফ আর তারই ফাঁকে কালো পাথর ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

জায়গা তো পাওয়া গেল, কিন্তু এবার আর এক সমস্যা। বাংলাদেশের গ্রামে গুপী বাঘাকে দেখানো হয়েছে পরনে পিরেন, কাঁধে চাপানো দোলাই, আর খাটো করে পরা ধুতি। এই অবস্থাতেই তারা হাততালি দিয়ে বরফের দেশে হাজির হয়েছে। তার মানে তাদের যখন প্রথম দেখতে পাচ্ছি বরফের উপর, তখন তাদের গায়ে এই গ্রামের পোশাকই থাকবে। অথচ এই ঠাণ্ডায় এ পোশাক চলবে কী করে? গুপী বাঘার অবিশ্যি উৎসাহের শেষ নেই। তারা বলল গ্রামের পোশাকেই বরফে নামবে। কিন্তু আমাদের কাছে এটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, পিরেনের তলায় তারা পরবে হাতকাটা পুলোভার, আর পায়ে চাপাবে নাইলনের তৈরি লম্বা মেয়েদের মোজা। এই মোজার রঙ চামড়ার রঙের থেকে তফাত করা যাবে না—আর তাই একটু দূর থেকে আর মোজা বলে মনে হবে না। এ ছাড়া দু'জনেরই পায়ে থাকবে ভূতের রাজার দেওয়া জাদু জুতো। এই জুতো আমাদের ছবির জন্য তৈরি করা স্পেশ্যাল জুতো।

দৃশ্যটি যাতে জমে ভাল তাই ঠিক করা হল যে, বরফের প্ল্যাটফর্মের উপর পড়েই গুপী বাঘা ঠাণ্ডায় এবং ভড়কানিতে লাফাতে শুরু করবে, আর তার ফলে তারা ওই বারো হাত উঁচু থেকে পা হড়কে বরফের গা দিয়ে গড়িয়ে সটান একেবারে নীচে এসে পড়বে। আইডিয়াটা ভাল, আর গুপী বাঘাও রাজি, কিন্তু মনে ষোলো আনা ভরসা আসছে না। এই ভাবে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে কী ধরনের বিপদ হতে পারে তা আমাদের জানা নেই।

এ নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি, এমন সময় একজন স্থানীয় লোক আমাদের কথাবার্তা শুনে আশ্বাস দিল যে, এতে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। আমরা পাহাড়ের যে অংশ পেয়েছি সেখানে নাকি বরফের তলায় লুকনো কোনও গর্তটর্ত নেই, বা এবড়ো খেবড়ো পাথরও নেই। কথা শুনে মনে হল, লোকটি নির্ভরযোগ্য। তারই উপর

ভরসা করে ক্যামেরা খাটানো হল আর গুপী বাঘাও বরফের ফাঁকে ফাঁকে পাথরের উপর পা ফেলে উপরে উঠে সেই সমতল জায়গাটায় গিয়ে হাজির হল। শট্‌টা নিতে মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগল না। এটা বোধহয় না বললেও চলবে যে এ ধরনের শট্‌-এর রিহার্সাল নেওয়া সম্ভব নয়, একেবারে সরাসরি দুর্গা বলে ক্যামেরা চালিয়ে দিতে হয়—তারপর যা হয় হবে।

বরফের গা দিয়ে গুপী বাঘার গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য হয়তো তোমাদের মনে আছে। কিন্তু শট্‌টা শেষ হবার পরেই যে ঘটনাটা ঘটল সেটা তোমাদের জানার কথা নয়।

দুই মূর্তিমান গড়াগড়ি অবস্থা থেকে কোনও মতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই বলল, 'আমাদের চটি হারিয়ে গেছে।' কী ব্যাপার? কখন হারাল? জানা গেল একেবারে শট্‌-এর শুরুতেই। দুটো লাফ মারতেই নাকি দু'জনের চটি খুলে বরফের তলায় তলিয়ে গেছে!

আধ ঘণ্টা বরফ খোঁড়াখুঁড়ি করেও সে চটির আর কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। গ্রীষ্মকালে বরফ গলার আগে আর সে চটি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেই ভূতের চোখ আঁকা চটিগুলো কবে কী ভাবে কুফরির কোন অধিবাসীর চোখে পড়বে, আর পড়লে তখন তার মনের ভাব কী হবে কল্পনা করতে বেশ মজা লাগছিল। যাই হোক, চটি তৈরি করানোর সময়ই এক জোড়া করে এক্সট্রা করিয়ে রাখা হয়েছিল তাই রক্ষে।

এর পরের শট্‌গুলো বেশ ভালভাবেই উতরে গেল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে গুপী বাঘা হাতে তালি মেরে গরম জামা চায়, আর তৎক্ষণাৎ তাদের গায়ে এসে যায় তিব্বতী পশমের পোশাক। এই পোশাক আমরা জোগাড় করেছিলাম কলকাতারই এক সাহেবের কাছ থেকে। গায়ে গরমজামা চাপামাত্র বাঘা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। গুপীর দিকে মুঠো মুঠো বরফ ছুড়ে মারতে মারতে বলে—'এই তোমার ঝুণ্ডী? এইখানে হবে তোমার গানের বাজি?' অগত্যা গুপীকে বলতে হয়, 'তা হলে চলো হুণ্ডীই যাওয়া যাক'! নতুন গ্রামের বালির উপর বাঁশের মাচার বদলে এবার কুফরির বরফের উপর লোহার মাচা খাটানো হয়। ক্যামেরা তার নীচে বসে, আর গুপী বাঘা মাচায় চড়ে ক্যামেরার সামনে বরফের উপর লাফিয়ে পড়ে। ব্যস, কুফরি-পর্বের শুটিং শেষ। এবার চলো, মরুভূমির দেশে।

আমাদের দেশে একমাত্র মরুভূমি হল পশ্চিম রাজস্থানের থর। গুপী গাইনের ভাল রাজার দেশ শুণ্ডী আর দুষ্টু রাজার দেশ হাল্লা—এই দুটো জায়গার জন্য রাজস্থানের দুটো শহর বুঁদি আর জয়সলমির বাছা হয়েছিল। গাছপালা ফুল ফসল হ্রদ পাহাড় সব মিলিয়ে বুঁদির মতো

এমন সুন্দর শহর রাজস্থানে কমই আছে। আর ঠিক উল্টো হল জয়সলমির—সেখানে সবুজ নেই বললেই চলে, আর তার সৌন্দর্যের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর রুক্ষ ভাব আছে। জয়সলমিরে কিন্তু যাকে মরুভূমি বলে ঠিক সে জিনিস নেই। সেটা পেতে হলে নাকি মাইল পঁচিশেক পশ্চিমে যেতে হয়। কাজের ফাঁকে আমরা একদিন গুপী বাঘাকে নিয়ে তাদের শুণ্ডীতে আসার দৃশ্য তোলার জন্য মরুভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

যে জায়গায় আমরা হাল্লারাজার মেলার দৃশ্য তুলেছিলাম, সেটাকে পাশ কাটিয়ে জয়সলমির পিছনে ফেলে মাইলখানেক গিয়ে একটা পাথরে ভরা নালা পেরিয়ে আমরা যে অঞ্চলটায় পৌঁছলাম সেখানে জিপ ছাড়া আর কোনও গাড়ি চলবে না। আমরা অবিশ্যি জিপেই চলেছি, তবে সব সময় যে পথ দিয়ে চলেছি তা নয়। ড্রাইভারের গতিবিধি দেখে মনে হয় সে এ তল্লাটের নাড়ীনক্ষত্র জানে, আর না হয় কিছুই জানে না, তাই চোখ কান বুজে যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই পাড়ি দিচ্ছে আল্লার নাম করে! এদিকে বালির চিহ্ন যেন ক্রমে কমে আসছে। দশ মিনিট অন্তর মরুভূমি কোথায় জিগ্যেস করাতে সে খালি বলে 'মিল যায়গা'। এটুকু জানি যে আমাদের মোহনগড় বলে একটা জায়গা পেরোতে হবে। গড় বললেই কেল্লার চেহারা ভেসে ওঠে, তাই মনে একটা আগ্রহের ভাব রয়েছে—বিশেষ করে এই কারণে যে, রাজস্থানের কোনও বইয়ে মোহনগড়ের কোনও উল্লেখ পাইনি।

দশ-বারো মাইল যাবার পর এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে রাস্তা বলে সত্যিই আর কিছু নেই। শুধু রাস্তা নয়, গাছপালা, ঘর বাড়ি, টিলা পাহাড়, সব উধাও, আর সেই সঙ্গে বালিও উধাও। এটুকু বলতে পারি যে, ভারতবর্ষে অনেক ঘুরেও এমন দৃশ্য এর আগে কোথাও দেখিনি। আর দৃশ্য যে একই রকম তা নয়। একবার দেখছি নুড়ি পাথরের রাজ্য; কিছু দূর গিয়ে দেখছি সেটা হয়ে গেল খোলামকুচির রাজ্য, আর তার পরেই এসে গেলাম ঝামার রাজ্যে। আর এ সব রাজ্যের কোনওটাই সমতল নয়। গাড়ি ধীরে ধীরে উপরে উঠছে আবার ধীরে ধীরে ঢাল দিয়ে নেমে যাচ্ছে। যেদিকে দু'চোখ যায় কেবল বিশাল জমাট-বাঁধা ঢেউ। অদ্ভুত দৃশ্য ঠিকই, কিন্তু এতে আমাদের কাজ চলবে না। কারণ আমাদের দরকার মরুভূমি। বরফের পর মরুভূমি হলে তবেই না মজা, দেখেই মনে হবে গুপী বাঘা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দেশ থেকে প্রচণ্ড গরমের দেশে এসে পড়েছে।

যে পথ দিয়েই যাওয়া হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মোহনগড় পৌঁছানো গেল। গড় একটা আছে বটে, কিন্তু এ সেই রাজস্থানের ঐতিহাসিক কেল্লা নয়। এ হল একটা আধুনিক খুদে কেল্লা, দেখলে

রোমাঞ্চর চেয়ে হাসিই আসে বেশি। তবু কেল্লা বলে কথা, একবার ভিতরে যাওয়া দরকার। গিয়ে দেখি কেল্লার উঠোনে পাঠশালা বসেছে। যুদ্ধ যে এখানে কস্মিনকালেও হয়নি সেটা আর বলে দিতে হয় না।

এদিকে বিশ মাইল এসে গেছি তবু মরুভূমির কোনও চিহ্ন নেই। এত মেহনত, এত পেট্রোল খরচা, জিপের এত হাড় নড়বড় করা ঝাঁকুনি সব কি মাঠে মারা যাবে ?

শেষে মোহনগড়েরই একজন লোক বলল যে, আমরা নাকি গোড়াতেই ভুল রাস্তা ধরেছি—মরুভূমি পেতে হলে অমুক দিকে যেতে হয়—এদিকে নয়। কথাটা শুনে মাথায় হাত দেব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের জিপের ড্রাইভাররা বললেন যে, এত দূরে এসে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। আরও খানিকটা পশ্চিমে যাওয়া হোক। এই শেষ চেষ্টায় যদি ফল না হয় তা হলে জয়সলমির ফিরে যাওয়া হবে।

তাদের কথায় আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম, আর এবার কয়েক মাইল যেতেই এমন একটা জায়গায় এসে পড়লাম যেটাকে হয়তো মরুভূমি বলা ঠিক হবে না, কিন্তু আমার ছবির পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কল্পনা করা যায় না। এ জায়গার কোনও নাম যদি থেকেও থাকে সেটা জানা হয়নি। এখানে বালি আছে, কিন্তু মরুভূমির শুকনো ঢেউ খেলানো বালি নয়। এ বালি চাপ বেঁধে সমতল হয়ে বিছিয়ে আছে, চারিদিকে দিগন্ত পর্যন্ত, পা ফেললে বোঝা যায় তার ভিতরটা জোলো। তারই মধ্যে আবার ফাঁকে ফাঁকে একেবারে শুকনো অংশও আছে, সেখানে বালির রং একটু ফিকে। সমস্ত প্রান্তরের উপর দুপুরের রোদ এসে পড়েছে, আর সে রোদ প্রতিফলিত হয়ে চোখ ঝলসে দিচ্ছে। আসলে ফেব্রুয়ারির শেষে এখানে গরম নেই, কিন্তু ক্যামেরার চোখে এটা যে সাহারার সামিল হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জায়গাটায় পৌঁছনোমাত্র জিপ থামাতে বললাম। অনেক খোঁজার পর মনের মতো জায়গা পেয়ে কেমন যেন একটা দম বন্ধ করা উত্তেজনা হয় ; এখনও তাই হচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে পশ্চিম দিকে চাইতেই এক মুহূর্তের জন্য হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। কোথায় এসে হাজির হয়েছি আমরা ! রাজস্থানের এ অঞ্চলে এত বিশাল একটা হ্রদ আছে এ কথা তো কেউ বলেনি আমাদের। হ্রদ না বলে সমুদ্রও বলা যেত, কিন্তু জলে ঢেউ-এর চিহ্নমাত্র নেই দেখে সেটা আর বলতে পারলাম না। সারা পশ্চিম দিকটা জুড়ে বালু প্রান্তরের শেষ মাথায় স্পষ্ট দেখছি জলের রেখা। তাতে ছায়া পড়েছে আকাশের মেঘ আর ডান দিকে বহু দূরে একসার গাছের। এ দৃশ্য প্রথমে আমাদের সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিলেও পরে বুঝতে বাকি রইল না যে হ্রদ নয়, মরীচিকা। আর এমনই

মরীচিকা, যেমন সচরাচর দেখা যায় না।

গুপী বাঘাকে নিয়ে আমাদের দেড় মিনিটের দৃশ্য তুলে সন্ধ্যায় জয়সলমির ফিরে এসে স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম যে এই আশ্চর্য জায়গা আর সেখানকার মরীচিকার কথা অনেকেই জানেন। তাঁরাই বললেন যে এই মরীচিকা শুধু মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়ারদেরও নাকি বোকা বানিয়ে দেয়। প্রতি বছর পালে পালে তৃষ্ণার্ত হরিণ জল ভেবে এরই দিকে হাঁটতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত জলের নাগাল না পেয়ে প্রাণ ত্যাগ করে।

হাল্লারাজার সেনা

সোনার কেল্লায় জয়সলমিরে ট্রেন আর উটের দৃশ্য তুলতে গিয়ে কী ঝক্কি পোয়াতে হয়েছিল সেটা তোমাদের বলেছি। সেখানে উট ছিল মাত্র পাঁচটা। আর গুপী গাইন ছবিতে হাল্লার সেনার দৃশ্য তুলতে আমাদের কত উটের দরকার হয়েছিল জান ? এক হাজার। আর সেনা মানে তো শুধু উট নয়, তার জন্য সোয়ার চাই ; আর শুধু সোয়ার হলেও চলে না— তাদের জন্য চাই সৈন্যের সাজ-পোষাক ঢাল তলোয়ার বল্লম নিশান পায়ের নাগরা, সব কিছুই। এই সব জোগাড় হলে পরে তাদের নিয়ে শুটিং। সত্যি বলতে কি, এরকম বিরাট শুটিং এর আগে আমরা কখনও করিনি। তাই এটা হয়েছিল আমাদের সকলের পক্ষেই চিরকাল মনে রাখার মতো একটা ঘটনা। এই শুটিং-এর বিষয় আজ তোমাদের কিছু বলব।

সন্দেশে পড়া উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন' গল্প থেকে যখন 'গুপী গাইন' ফিল্ম করার জন্য চিত্রনাট্য লিখি, তখন হাল্লার দৃশ্য ভারতবর্ষের কোথায় তোলা হবে তা ঠিক ছিল না, তবে এটা মাথায় ছিল যে হাল্লার সৈন্য হবে অশ্বারোহী। ট্রেনে আর মোটরে করে নানান জায়গা ঘুরে দেখতে দেখতে অবশেষে যখন রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তে মরু অঞ্চলের জয়সলমির শহরে পৌঁছলাম, তখন মনে হল হাল্লার জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা আর পাওয়া যাবে না। অথচ রাজস্থানের এই অঞ্চলে ঘোড়া নেই, আছে উট। তাই অশ্ববাহিনী হয়ে গেল উষ্ট্রবাহিনী।

কিন্তু খাতায় ঘোড়া কেটে উট লিখে দিলেই তো আর কাজ ফুরিয়ে গেল না, বরং এটা হল কাজের শুরু। এর পরে আছে অনেক হিসেব, অনেক প্ল্যানিং, অনেক তোড়জোড়। হাল্লার সৈন্যদের জন্য সাজ পোশাকের নকশা করতে হবে। তার মানে মাথার পাগড়ি থেকে পায়ের

নাগরা পর্যন্ত সব কিছু চাই, তা ছাড়া আছে ঢাল, তলোয়ার, তলোয়ারের খাপ, বল্লম, পতাকা। সেনাপতির জন্য আবার চাই একটু বিশেষ ধরনের পোশাক, বর্ম, আর শিরস্ত্রাণ।

এই সব কিছুর নকশা করে জিনিসগুলো তৈরির অর্ডার দেওয়া হয়েছিল বোম্বাইয়ের এক কোম্পানিকে, যারা অনেকদিন থেকে ফিল্মে ব্যবহারের জন্য এসব জিনিস তৈরি করে আসছে। হাজারের কমে সেনাবাহিনী বোঝানো যাবে না এই আন্দাজ করে প্রত্যেকটা জিনিসই তৈরি করতে দেওয়া হয়েছিল হাজারটা করে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে এসব তৈরি করে চারটি লরির পিঠে ট্রাঙ্ক বোঝাই করে তুলে দেওয়া হবে। সেই লরি বোম্বাই থেকে জয়সলমিরে এসে পৌঁছলে পর তবে আমাদের হাল্লার সেনার শুটিং হবে।

এখন কথা হচ্ছে, উট জিনিসটা তো রাজস্থানের মাঠে ঘাটে যেখানে সেখানে দেখা যায়, কিন্তু মালিক সমেত হাজার উট ঠিক যেদিন চাইব সেদিন শুটিং-এর জায়গায় জমায়েত হবে কী করে ?

ঠিক হল এ ব্যাপারে জয়সলমিরের রাজার সাহায্য চাওয়া হবে। আমার জওহরনিবাস বলে যে বাড়িটায় আস্তানা করেছিলাম, তার দোতলার ঘরের জানালা দিয়ে উত্তর দিকে চাইলেই রাজপ্রাসাদ দেখা যায়। আমি ও আমাদের দলের আরও জনাচারেক লোক আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এক সকালে গেলাম রাজার সঙ্গে দেখা করতে। মানুষটিকে দেখে রাজা বলে বোঝার উপায় নেই ; অন্তত রাজপুত রাজা বলতে গোঁফ-গালপাট্টা সমেত যে জাঁদরেল চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে এনার চেহারার কোনই মিল নেই। কিন্তু ইনি যে ক্ষমতা রাখেন সেটা তাঁর কথাতেই বোঝা গেল। আমাদের ব্যাপারটা শুনেটুনে বললেন 'হাজার উট ? সে আর এমন কি কথা ; কুমার বাহাদুরকে বললেই ও ব্যবস্থা করে দেবে।'

কুমার বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আগেই। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবক, মোটর সাইকেলে ফট্ ফট্ করে রাস্তায় বালি উড়িয়ে ঘুরে বেড়ান, সম্পর্কে রাজার কিরকম যেন ভাই। তাঁকে অনুরোধ করতে তিনি সানন্দে উটের ব্যবস্থা করার ভার নিলেন। জয়সলমিরে ফিল্মের শুটিং হবে শুনে তিনি এমনিতেই ভারি মেতে উঠেছিলেন।

তোমাদের মধ্যে যারা গুপী গাইন ছবি দেখেছ, তারা জান যে হাল্লার সেনাকে নিয়ে একটি মাত্র দৃশ্যই আছে— যদিও সে দৃশ্য বেশ ঘটনাবহুল। হাল্লারাজ শুণ্ডীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, এক বিশেষ দিনে সৈন্য জমায়েত হয়েছে। উট ও সেনা দুইই আপাতত মাটিতে বসা,

সেনাপতি তাঁর উটের পিঠ থেকে হুকুম করলেন— 'উট উঠাও !'—কিন্তু আধপেটা খাওয়া সৈন্যদল হুকুম না মেনে বসেই রইল। সেনাপতি হন্তদন্ত হয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা রিপোর্ট করলেন, মন্ত্রী অগত্যা যাদুকর বরফির শরণাপন্ন হলেন। বরফি মুহূর্তের মধ্যে মন্ত্রবলে সৈন্যদের উটের পিঠে চড়িয়ে দিলেন। সৈন্য রওনা দেয়, এমন সময় গুপী-বাঘা হারানো ঢোল ও জুতোর সন্ধান পেয়ে ঝড়ের মতো এসে 'ওরে হাল্লারাজার সেনা' গান গেয়ে সেনাবাহিনীকে রুখে দেয়। গানের শেষে আকাশ থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নেমে আসে, বুভুক্ষু সেনা উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পাগলের মতো দৌড়ে গিয়ে গোগ্রাসে মণ্ডামিঠাই মিলতে থাকে। মন্ত্রীমশাইও একটি হাঁড়ি নিয়ে সটকাবার তাল করছিলেন, কিন্তু তাঁরই সেনার পায়ের তলায় সে হাঁড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই হুলুস্থুলের মধ্যে এক ফাঁকে গুপী বাঘা হাল্লারাজাকে তুলে নিয়ে শুণ্ডীর উদ্দেশে হাওয়া হয়ে যায়। এই সৈন্য সমাবেশের দৃশ্য তোলার জন্য একটা চমৎকার জায়গা বাছা হয়েছিল কেল্লার পূবদিকে। তিন দিকে ধুধু প্রান্তর, গাছ-পালার চিহ্নমাত্র নেই, আর জমিতে বালি থাকলেও তা মোটেই গভীর নয়— অর্থাৎ পা বসে যায় না, তাই চলতে ফিরতে কোনও অসুবিধা নেই। উত্তরদিকে মাইল খানেক জায়গা জুড়ে পাঁচিলের মতো খাড়াই উঠে গেছে পাথুরে পাহাড়। এই পাহাড়ের মাথাটা আবার সমতল। এরই একটা অংশে একাদশ শতাব্দীতে ভাটি রাজপুতরা বানিয়েছিল তাদের কেল্লা। এই ধরনের পাহাড়—যাকে ইংরাজিতে বলে table mountain —রাজস্থানের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। চিতোরের দুর্গ ও শহরও এইরকমই একটা মাথা-চাঁছা পাহাড়ের উপর তৈরি।

শুটিং-এর জায়গার একটা অংশে ছিল প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র। প্রায় দুশো গজের মতো জায়গা জুড়ে নানান আকারের হলদে পাথরের সমাধিস্তম্ভে জায়গাটা ভরা। এটা দেখার পর ঠিক করেছিলাম গুপী যেখানে গাইতে গাইতে সৈন্যদের দিকে এগিয়ে আসছে, সেখানে 'মিথ্যে অস্ত্র শস্ত্র ধরে প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে, রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল'—এই অংশটায় গুপী-বাঘা হাঁটবে এই সমাধি ক্ষেত্রের উপর দিয়ে।

শুটিং-এর দিন সকালে জওহর নিবাসে খবর এল মালিক সমেত এক হাজার উট যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হয়েছে। আমরা সকলে একসঙ্গে নিশ্চিন্তির হাঁফ ছাড়লাম। দুদিন আগেই বোম্বাই থেকে লরিতে করে সাজ-পোশাক এসে গেছে, এবং ইতিমধ্যে ট্রাঙ্ক থেকে সে সব পোশাক অস্ত্রশস্ত্র পাগড়ি বল্লম পতাকা সব কিছুই বার করে এক এক করে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। এইসব জিনিস এখন পাঠিয়ে দেওয়া হল দু'মাইল

দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে। হাল্লার সেনাকে সাজ পরানো তো কম কথা নয়। এর জন্য আমাদের দলে জনা দশেকের বেশি লোক নেই। আমরা আন্দাজ করেছিলাম ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে কাজটা সারতে। সকালে অন্য শুটিং রাখা হয়েছে; সেটা সেরে দুপুর দুটো নাগাদ আমরা হাজির হব যুদ্ধক্ষেত্রে। তখন থেকে শুরু করে ঘণ্টা চারেক শুটিং অনায়াসে করা যাবে, কারণ মাসটা হল মার্চ— রোদ থাকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত।

আমাদের দলে লোক ছিল সবশুদ্ধ জনা চল্লিশেক। অভিনেতাদের মধ্যে গুপী বাঘা বাদে ছিল হাল্লার রাজা (সন্তোষ দত্ত), হাল্লার মন্ত্রী (জহর রায়), সেনাপতি (শান্তি চট্টোপাধ্যায়), গুপ্তচর (চিন্ময় রায়), জনা পাঁচেক পেয়াদা (কামু মুখার্জি, অশোক মিত্র, রাজকুমার লাহিড়ি ইত্যাদি)। এ ছাড়া ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, মেক-আপম্যান, এঁদের সকলের সহকারী, আমার নিজের চারজন সহকারী, আলো রিফ্লেক্টর ক্যামেরা ও সাউন্ডের সরঞ্জাম বইবার লোক, প্রোডাকশন ম্যানেজার ও তাঁর দলের লোক ইত্যাদি মিলিয়ে আরও জনাত্রিশেক। এর মধ্যে এক জহর রায় ছাড়া আমরা আর সকলেই আগে আগে একসঙ্গে এসে কাজ শুরু করে দিয়েছি। জহর রায় আসবেন কলকাতার একটা শুটিং শেষ করে। যোধপুর থেকে দেড়শো মাইল ট্যাক্সিতে আসবেন। জয়সলমির এসে পৌঁছনোর কথা রাত দশটায়, এলেন মাঝরাত্তিরে, আড়াইটার পর। কী ব্যাপার? জানা গেল মাঝপথে নাকি চলন্ত ট্যাক্সি উল্টে গিয়েছিল। জহরবাবুর নাক যে জখম হয়েছে সেটা চোখেই দেখতে পাচ্ছিলাম। বললেন, 'আরে মশাই— চাঁদনি রাত, ষাট মাইল স্পিডে চলেছি, দিব্যি পিচ ঢালা সোজা রাস্তা, অন্য গাড়ির চলাচল নেই—সর্দারজি ড্রাইভার বাঁ হাত কাঁধের পিছনে রেখে ডান হাতে আপেল নিয়ে তাতে কামড় দিচ্ছেন, স্টিয়ারিং-এ রেখেছেন নিজের ভুঁড়িটা। সেটাকে একটু এদিক ওদিক করলেই গাড়ি এদিক ওদিক ঘুরছে। এমন সময় হুশ্ করে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেল খরগোশ। তাকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ি গেল উল্টে। আমার হুঁশ ছিল, দেখলাম আমি গড়াচ্ছি, আর আমার পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে দুটো হোল্‌ডঅল। খটকা লাগল—হোল্‌ডঅল তো সঙ্গে একটি, অন্যটি এল কোত্থেকে? বুঝলাম ওটি হলেন আমাদের সর্দারজি।'

আশ্চর্য এই যে, জহরবাবু, ড্রাইভার সাহেব ও গাড়ি, এই তিনটের কোনওটাই খুব বেশি জখম হয়নি। ফলে হাল্লার সেনার দৃশ্যে অ্যাকটিং করতে জহরবাবুর বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

অভিনেতা বাদে এই যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন লোক, একটা বড় রকমের শুটিং হলে এদের সকলকেই কাজে লেগে যেতে হয়। হলিউড বা বিলেত বা বোম্বাই হলে হাজার উট সমেত হাল্লারাজার সেনার এই দৃশ্য

তুলতে মাইনে করা কাজের লোক থাকত অন্তত শতিনেক। সেখানে আমাদের কাজ চালাতে হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনকে নিয়ে। তোড়জোড় শুরু হয়ে যাবে ভোর চারটে থেকে, যাতে নাকি সাড়ে ছটার মধ্যে শুটিং-এর জায়গায় পৌঁছে সাতটার মধ্যে শট্ নেওয়া শুরু করে দেওয়া যায়। সকাল আর বিকেলের রোদটা ফোটোগ্রাফির পক্ষে সবচেয়ে ভাল, তাই সেটা মাঠে মারা গেলে চলে না।

আজ অবিশ্যি আমরা সকলে অন্য জায়গায় হালকা কাজ রেখেছিলাম, কারণ জানতাম বিকেলে ঝক্কি আছে। সকালে শুটিং শেষ করে বারোটা নাগাদ জওহর নিবাসে ফিরে এসে স্নান খাওয়া এবং সামান্য বিশ্রাম সেরে দুটোয় গিয়ে হাজির হলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। উটের বহর আর বাহার দেখে চোখ মন একসঙ্গে জুড়িয়ে গেল। রাজস্থানের সব উটওয়ালাদের কাছেই ঝালর দেওয়া কড়ি বসানো চমৎকার সব রঙিন উটের পোশাক আর জাজিম থাকে। এদের সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন উটগুলোকে সাজপোশাক পরিয়ে নিয়ে আসে।

উট তো হল, কিন্তু সৈন্যদের এ চেহারা কেন? কোথায় গেল আমাদের লাল নীল হলদে পোশাক, আর কোথায় গেল সেই বাহারের উষ্ণীষ? আর হাজার জোড়া নাগরা যে কেনা হল, সেগুলোই বা এরা পরেনি কেন? এতো দেখছি সবাই সাধারণ সাদা পোশাক পরে বসে আছে, যেমন সব সময়েই থাকে।

জিগ্যেস করে আসল কারণটা জানা গেল। উটওয়ালাদের মধ্যে বেশির ভাগই মুসলমান, আর মুসলমানদের নাকি সাদা ছাড়া আর কোনও রঙে ঘোর আপত্তি। বোম্বাইয়ের তৈরি বাহারের পোশাক দেখে তারা কেউ কেউ হেসেছে, কেউ কেউ বিশ্রী ভাবে ভুরু কুঁচকে মাথা নেড়েছে, আবার কেউ সে পোশাক হাতে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন উপায়? এদের ব্যাপারটা ভাল করে বোঝাতে হয়, নইলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

কিন্তু এক হাজার লোককে একসঙ্গে বোঝানোর কোনও উপায় আছে কি? আছে। খোলা মাঠে ভিড় নিয়ে কাজ করতে হবে জেনে আমরা কলকাতা থেকে আসার সময় সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে একটা ব্যাটারি অপারেটেড লাউডস্পিকার কিনে এনেছি। এ জিনিস তোমরা অনেকেই হয়তো দেখেছ— কাঁধে ঝোলানো ব্যাটারির সুইচ টিপে একটা চোঙার মতো জিনিস মুখের সামনে ধরে কথা বললেই গলার স্বর অনেকগুণ বেড়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

ডাক পড়ল তিনু আনন্দের। তিনু আমার চারজন সহকারীর

একজন। সে বোম্বাই থেকে এসেছে, তার ভাষা হিন্দি— যদিও বাংলাও ভাঙা ভাঙা বলতে পারে এবং চটপট শিখে নিচ্ছে। লাউডস্পিকারটা তিনুর হাতে দিয়ে তাকে শিখিয়ে দিলাম উটওয়ালাদের কী বলতে হবে। বললাম, 'বলো— তোমরা এখন আর উটওয়ালা নও, তোমরা হচ্ছ সৈন্য। তোমরা সবাই এক-একজন বীর যোদ্ধা। তোমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছ। তোমাদের উটের এত বাহার, তোমাদের সেনাপতি এত বাহারের পোশাক পরেছে, তোমরাও যদি রঙিন পোশাক পরে হাতিয়ার নিয়ে উটের পিঠে চড়, তবেই না তোমাদের খুবসুরৎ দেখাবে, বীর বলে মনে হবে, লোকে দেখে বাহবা দেবে। এখানে তো আর তোমরা সামান্য উটপালক নয়। তোমরা সবাই হলে ফিল্মের অ্যাক্টর'—ইত্যাদি।

তিনু আমাদের থেকে হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে উটওয়ালাদের দিকে মুখ করে চোঙা মুখের সামনে এনে কাজে লেগে গেল। একটা গগনভেদী 'ভাইয়োঁ'-র পর কোনও কথা শুনতে না পেয়ে তিনুর দিকে ফিরে দেখি সে নানারকম অঙ্গভঙ্গি সহকারে দিব্যি নেতা-নেতা ভাব করে মুখ নেড়ে চলেছে, কিন্তু তার চোঙা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। অর্থাৎ ব্যাটারিটি অকেজো হয়ে গেছে। এটা যাঁর হাতে লাউডস্পিকার রয়েছে তিনি নিজে অনেক সময়ই বুঝতে পারেন না, কারণ নিজে তিনি নিজের কথা স্পষ্টই শুনছেন।

এর পরে অবিশ্যি লাউডস্পিকারটা মাঝে মাঝে কাজ করলেও সেটার উপর আর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারিনি। আজকের কাজটা আমরা সকলে ভাগাভাগি করে উটওয়ালাদের মধ্যে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনও মতে সারলাম। দু'একজন করে লোক নিজেদের পোশাক ছেড়ে যুদ্ধসাজ পরতেই ক্রমে বাকিরাও তাদের দেখাদেখি তৈরি হয়ে নিল।

প্রথম কাজ শুরু হল গানের দৃশ্য দিয়ে। সৈন্যদল এখানে উটের পিঠে অনড় হয়ে বসে থাকবে। উটওয়ালাদের মধ্যে যাদের বয়স কমের দিকে তাদের একটু ছটফটে মনে হওয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হল একেবারে পিছন দিকে। সামনের দিকে রাখা হল যত মাঝবয়সী আর বুড়োদের। উট যদি এলোমেলো ভাবে দাঁড়ায় তা হলে যুদ্ধে যাওয়ার ভাবটা আসে না। 'ফরমেশন' হয় না। তাই আরও মিনিট পনেরো সময় দিয়ে তাদের সার বেঁধে দাঁড় করানো হল। তার পর শুরু হল শুটিং।

সাড়ে চার মিনিটের গান। সেটা তোলা হবে অন্তত চল্লিশটা বিভিন্ন শটে, এক একটি শট্ নিতে সময় লাগবে আন্দাজ গড়ে পনেরো মিনিট করে। কিছু শটে গুপী-বাঘাকে দেখা যাবে, কিছু শটে শুধু সৈন্যদের, আবার কিছুতে গুপী বাঘা সৈন্য সব কিছুই একসঙ্গে দেখা যাবে। প্রত্যেক শট্-এর সঙ্গে সঙ্গে প্লে-ব্যাক যন্ত্রে গান চলবে, গুপী সেই গানের

সঙ্গে ঠোঁট মেলাবে, বাঘা মেলাবে ঢোলের কাঠি, আর ক্যামেরাও এদিক ওদিক চলবে গানের ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে।

মিষ্টিবর্ষণের আগে পর্যন্ত গানের শট্ প্রথম দিন তিন ঘণ্টায় শেষ হয়ে গেল। মিষ্টির দৃশ্য তোলা হবে আগামীকাল। উট এবং উটওয়ালা জয়সলমিরেই থাকবে, তাদের খোরাকি দেব আমরা।

মিষ্টির ব্যাপারটা বলার আগে একটা অন্য ঘটনা বলে নিই, কারণ এটা ঘটেছিল এই প্রথম দিনেই।

রোদ পড়ে যাওয়া পর্যন্ত কাজ করার পর সবাই যখন ঘরে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছি, উটওয়ালারা আমাদের পোশাক খুলে ফেলে তাদের নিজের পোশাক পরছে, হাল্লার সেনাপতি নধরকান্তি শ্রীমান শান্তি চট্টোপাধ্যায় উটের পিঠ থেকে নেমে হাড়গোড় সব ঠিক আছে কিনা টিপে টিপে দেখে নিচ্ছেন, এমন সময় কোত্থেকে জানি ভেসে এল এক আশ্চর্য সুন্দর বাঁশির সুর। খোঁজ নিয়ে জানলাম বংশীবাদক নাকি উটের দলের সঙ্গেই এসেছেন, যদিও তিনি সেনার পোশাক পরেননি।

লোকটিকে খুঁজে বার করা হল। মাথায় পাগড়ি, গায়ে সাদা সার্টের উপর কালো ওয়েস্ট কোট, চোখে অমায়িক, উদাস দৃষ্টি। বয়স মনে হল চল্লিশের কাছাকাছি। ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে বাঁশি— তবে একটা নয় দুটো। এই লোকটির সঙ্গে আরেকজন রয়েছে দেখলাম, তার চেহারায় বেশ চোখে পড়ার মতো বিশেষত্ব। এর পোশাকও বংশীবাদকের মতোই, তবে দৈর্ঘ্যে ইনি ছ'ফুটের উপর। গায়ের রং এত পালিশ করা মিশকালো আর কারুর দেখেছি বলে মনে পড়ে না, আর তীক্ষ্ণ নাকের নীচে এমন গোঁফজোড়াও আর কারুর আছে কিনা জানি না। গোঁফের দুটো দিক বিরাট ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো আড়াই পাক প্যাঁচ খেয়ে দুটি গাল জুড়ে বসে আছে। পরে জেনেছিলাম প্যাঁচ খুলে গোঁফ দুদিকে টেনে সোজা করলে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দৈর্ঘ্য হয় সাড়ে তিন ফুটের কাছাকাছি।

আমরা বংশীবাদককে বললাম, তাঁর বাজনা আমাদের দূর থেকে শুনে খুব ভাল লেগেছে— তিনি কি সন্ধেবেলা আমাদের ডেরায় এসে একটু বাজনা শুনিয়ে যাবেন ? ইচ্ছে ছিল সম্ভব হলে এই বাঁশির রেকর্ড করে আমাদের ছবিতে ব্যবহার করব। বাঁশিওয়ালা এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল।

সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ জওহরনিবাসে এসে হাজির হল বাঁশিওয়ালা আর তার বন্ধু। আমার ঘরে মাটিতে কার্পেটের উপর বসে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বাঁশি শোনা ও রেকর্ড করা হল। শুরুতেই অবাক হলাম দেখে যে পকেট থেকে দুটো বাঁশি বার করে দুটোই এক সঙ্গে মুখে পুরলেন শওকত আলি (নামটা আগেই জেনে নিয়েছিলাম)। ফুঁ দেবার পরে বুঝলাম কী

আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে চলেছে। একটা বাঁশিতে কেবল একটা ফুটো ছাড়া অন্যগুলো সব মোম দিয়ে বন্ধ করে ফেলা হয়েছে। এই বাঁশি কাজ করবে সানাই-এর পোঁ-এর মতো। আর অন্য বাঁশির সব ফুটোই খোলা ; এতে বাজবে সুর। পরে জিগ্যেস করে জানলাম, এই বাঁশির নাম হল সাতারা। এর উৎপত্তি হয়েছে জয়সলমিরের পঁচিশ মাইল পশ্চিমে প্যাকিস্তান সীমানা থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে খুড়ি নামে একটি গ্রামে। ছোট্ট গরিব গ্রাম— কিন্তু সে গ্রামের প্রত্যেকটি লোক নাকি গান বাজনায় ওস্তাদ। এই গ্রামেই নাকি উদ্ভব হয়েছিল সাপুড়ের বাঁশির— যাকে রাজস্থানে বলে বিন— যা আজকাল ভারতবর্ষের সব শহরে শুনতে পাওয়া যায়।

শওকত আলির আশ্চর্য সুন্দর বাঁশি রেকর্ড করে তাকে শোনালে পর তার মুখের ভাব হল অদ্ভুত। সে বলল 'আমার একমাত্র ভাই সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে পাকিস্তানে। তোমরা যদি আমার এ বাঁশি রেডিওতে বাজাতে পারো, তা হলে সে হয়তো সেখান থেকে শুনতে পাবে।'

শওকত আলি যতক্ষণ বাঁশি বাজাল, তার সেই বন্ধুটি চুপ করে বসে রইল। দেখে মনে হচ্ছিল এর মতো নিরীহ লোক বুঝি আর হয় না। তাঁর গোঁফের বাহার আমাদের সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করেছিল, তাই এবার তাঁর-সঙ্গে একটু আলাপ করার ইচ্ছে হল।

পরিচয় জিগ্যেস করে যা জানলাম তাতে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ ; ইনি হচ্ছেন জাতে ভিল, নাম কর্ণ, আর ইনিই এককালে ছিলেন রাজস্থানের দুর্ধর্ষতম ডাকাত। বললেন, 'এখন আমাকে কী দেখছ— এক কালে আমার স্বাস্থ্য এমন ছিল যে একটা আস্ত জিপগাড়ি একটা কাঁধে তুলে নিতে পারতাম। দুবার আমাকে পুলিশ ধরে জেলে পোরে ; দুবারই আমি কয়েদ ঘরের জানালার লোহার শিক হাতে বেঁকিয়ে ফাঁক করে পালাই। তিনবারের বার এরা করল কী, আমাকে ধরেই আমার শরীর থেকে দুবাটি রক্ত বার করে নিল। রক্তই তো মানুষের প্রাণ সেটা গেলে আর কী থাকে বলো!'

এই ঘটনার সাত বছর পরে সোনার কেল্লার শুটিং করতে গিয়ে আবার এই কর্ণ ভিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাকে প্রথমে চিনতে পারিনি, কারণ গোঁফের সেই মার্কামারা প্যাঁচটি নেই, আর শরীরও যেন আরও ভেঙে গেছে। তার কাছে জানলাম যে, শওকত আলি নাকি তার জোড়া-বাঁশি নিয়ে পাকিস্তানে চলে গেছে। এবারে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। এই এককালের ডাকাতটিও বাঁশি বাজান, আর এও এক অভিনব বাঁশি। এর রাজস্থানি নাম হল নাড়। এরও উৎপত্তি সেই খুড়ি গ্রামে। এ বাঁশি লম্বায় আড়াই হাত। বাজানোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, ফুঁয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ের গলাতেও সুর চলতে থাকে। বাঁশির স্বর আর

গলার স্বর দুটোই গুরুগম্ভীর, আর দুটো মিলে বেশ একটা গা ছম ছম করা সংগীতের সৃষ্টি হয়। এ বাঁশিও নাকি সাতারার মতোই দেশে এই একটি লোকই বাজাতে পারে, কারণ এতে দম লাগে অফুরন্ত।

গান বাজনার কথা শেষ করে এবার, হাল্লার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসা যাক।

দ্বিতীয় দিন তোলা হবে গানের শেষ অংশ, অর্থাৎ গুপী যেখানে গাইছে— 'আয় আয় আয়রে আয়, মণ্ডামিঠাই হাঁড়ি হাঁড়ি'—ইত্যাদি।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেনাদের ঘোর কেটে যাবে, আর তারপর আকাশ থেকে নামবে মিষ্টির হাঁড়ি। এখানে বলে রাখি মিষ্টির হাঁড়ি নামার দৃশ্যে Trick photography-র প্রয়োজন হওয়াতে সেটা তোলা হয়েছিল কলকাতায়, আর তাতে নানা রকম ক্যামেরা আর ল্যাবরেটরির কারসাজি ব্যবহার করতে হয়েছিল। সে সব আর তোমাদের কাছে ভেঙে বলব না, তা হলে মজা মাটি হয়ে যাবে। হাল্লার যুদ্ধক্ষেত্রে কী হয়েছিল সেটাই বলি।

জয়সলমিরে এমনিতে খাবার দাবার বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তবে যে জিনিসটার অভাব নেই সেটা হল ক্ষীরের মিষ্টি। শ'খানেক বড় বড় মাটির হাঁড়ি অর্ডার দিয়ে করিয়ে তাতে ওই ক্ষীরের মিষ্টি ভরে সেগুলো লাইন করে রাখা হয়েছিল সৈন্য যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকে, উটের সামনের সারির প্রায় একশো গজ দূরে।

ছবিতে প্রথম দেখানো হবে গানের শেষে সৈন্যরা আকাশের দিকে দেখছে, তারপর তাদের মধ্যে 'মিঠাই, মিঠাই' বলে সোরগোল উঠবে। তারপর তারা উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে হাঁড়িগুলোর দিকে দৌড় দেবে, তারপর হাঁড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গোগ্রাসে মিষ্টি গিলবে। এরই মধ্যে আবার পেটুক মন্ত্রীমশাইকেও দেখানো হবে, তিনিও একটি হাঁড়ির সন্ধান করছেন, এবং ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের ভিড়ে পড়ে হিমসিম খাচ্ছেন।

ব্যাপারটা যখন সৈন্যদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন এক আজব সমস্যা দেখা দিল। আমাদের ধারণা ছিল সব উটওয়ালাই বুঝি মুসলমান, কিন্তু এখন জানা গেল তাদের মধ্যে অনেকেই নাকি হিন্দু। হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেতে হবে শুনেই রব উঠল হিন্দু আর মুসলমানের হাঁড়ি আলাদা করে সাজিয়ে দিতে হবে, দুই দল এক সঙ্গে হাঁড়ি থেকে খাবে না। কেউ কেউ আবার এও বলল যে, তাদের মিঠাইয়ের রুচি নেই। এই দ্বিতীয় সমস্যা সমাধান করার অবিশ্যি কোনও উপায় নেই। মিষ্টি যারা খায়ই না তাদের দিয়ে জোর করে গোগ্রাসে মিষ্টি গেলানোর কারসাজি আমার জানা নেই। কাজেই তাদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হল। হিন্দুদের বলা হল,

এইগুলো তোমাদের হাঁড়ি, আর মুসলমানদের বলা হল, তোমরা খাবে ওইগুলো থেকে।

তোড়জোড় শেষ করে শট্ নিতে যাব, এমন সময় দেখি আরেক কাণ্ড। সৈন্যরা যেখান দিয়ে হাঁড়ির দিকে ছুটবে সেই খোলা জায়গার মাঝখানে হঠাৎ একটা জিপ এসে হাজির। সর্বনাশ, স্বয়ং জয়সলমিরের মহারাজ এসেছেন শুটিং দেখতে— সঙ্গে আছেন মহারানী আর সাত বছরের ফুটফুটে রাজকন্যা। রানী বসেছেন জিপের পিছন দিকে পর্দার আড়ালে, আর রাজা বসেছেন রাজকন্যাকে কোলে নিয়ে সামনে, ড্রাইভারের পাশে। বাধ্য হয়ে তাঁকে গিয়ে বলতে হল যে তামাশা দেখার জায়গাটা বাছাইয়ে তাঁরা একটু ভুল করে ফেলেছেন। গাড়ি অন্তত ত্রিশ হাত দক্ষিণে না সরালে আমরা কাজই করতে পারব না। রাজা শুনলেন, আমাদের সমস্যা বুঝলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ি সরে গিয়ে আমাদের কাজের জায়গা খুলে দিল।

এই সব কিছুর পরেও হঠাৎ নতুন ভাবনায় মনটা খচ্ খচ্ করে উঠল। এমনি মিষ্টি খাওয়া এক জিনিস আর অনেকদিন আধপেটা খেয়ে হঠাৎ আকাশ থেকে পড়া অফুরন্ত মিষ্টি দেখে সে মিষ্টি খাওয়া আরেক জিনিস। এখানে দিশেহারা হয়ে হাভাতের মতো খাওয়ার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে রীতিমতো অ্যাকটিং-এর দরকার হবে। সে অ্যাকটিং যদি এই উটওয়ালাদের দ্বারা না হয়, তাই আমাদের অভিনেতাদের মধ্যে যাদের খাইয়ে বলে নাম আছে তাদের কয়েক জনকে চটপট মেক-আপের সাহায্যে রাজস্থানি দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে নিয়ে হাল্লার সেনার পোশাক পরিয়ে কাজে নামিয়ে দেওয়া হল।

তোমরা ছবির এই দৃশ্যে যাদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে খেতে দেখেছ, তাদের অনেকেই আসলে আমাদের লোক। তাদের মধ্যে একজন— কামু মুখার্জি (সোনার কেল্লার মন্দার বোস)—সেদিন একাই সাবাড় করে দিয়েছিল অর্ধেক হাঁড়ি মিষ্টি!

উট বনাম ট্রেন

তোমাদের মধ্যে যারা সোনার কেল্লা ফিল্ম দেখেছ, তারা জান যে সেখানে উটকে নিয়ে বেশ একটা মজাদার ঘটনা আছে। রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু মরুভূমিতে উটের পিঠে চড়ার স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্ন গল্পের শেষের দিকে আশ্চর্যভাবে ফলে যাচ্ছে। জয়সলমির যাবার পথে মন্দার বোসের চক্রান্তে ফেলুর গাড়ির টায়ার পাংচার হয়, তার ফলে ফেলু তোপ্‌সে লালমোহন পথে বসে। এমন সময় দূরে দেখা যায় উটের দল। আট মাইল দূরে রামদেওরা স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারলে মাঝরাত্তিরের ট্রেনটা ধরা যাবে। ফেলু স্থির করে এই পথটুকু তারা উটেই যাবে। ফেলু তোপসের তো কোনও চিন্তা নেই—দু'জনেই স্মার্ট, দু'জনেরই খেলাধুলো ব্যায়াম করা ছিমছাম শরীর—কিন্তু জটায়ু তো নামেই জটায়ু। উটের সামনে পড়ে অ্যাদ্দিনের স্বপ্ন যে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী জানোয়ার রে বাবা! নেশাখোরের মতো আধবোজা ঘোলাটে চোখ, এবড়ো খেবড়ো কোদালের মতো দাঁত, ঝোলা ঠোঁট উলটিয়ে অষ্টপ্রহর কী জানি চিবোচ্ছে—আর হাঁটলে পরে সর্বাঙ্গে যা দোলানি, দেখলে মনে হয় সওয়ারের হাড়গোড় সব আলগা হয়ে যাবে। না জানি এ জানোয়ারের পিঠে চড়লে কী ভোগান্তি আছে!

কিন্তু উপায় নেই। ফেলু তোপ্‌সে তড়াক তড়াক করে উঠে পড়ে, লালমোহন উঠতে গিয়ে প্রায় বেসামাল হয়ে কোনও রকমে ম্যানেজ করে। ফেলু উটওয়ালাদের হুকুম দেয়—'চলো রামদেওরা'।

উটের দল চলেছে সার বেঁধে, লালমোহন প্রমাদ গুনছে, মাঝপথে হঠাৎ তোপসের চোখ গেল—ওই দূরে ট্রেন আসছে। ওটাকে থামাতে পারলে আর রামদেওরা গিয়ে দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না। ছুট ছুট

ছুট! উটের দল লাইনের ধারে পৌঁছে যায়, ফেলু পকেট থেকে রুমাল বার করে প্রাণপণে নাড়তে থাকে, ট্রেন সে সংকেত অগ্রাহ্য করে মরুপ্রান্তর কাঁপিয়ে চোখের সামনে দিয়ে তারস্বরে সিটি মারতে মারতে বেরিয়ে যায়। ফেলু দাঁতে দাঁত চেপে বলে 'শাবাশ'। জটায়ু আধমরা। স্বপ্ন ভেঙে খান খান। এ শিক্ষা ভোলবার নয়। অগত্যা সবাই উটের পিঠেই চলতে শুরু করে রামদেওরা উদ্দেশে।

এই তো গেল উটের পর্ব। ছবিতে শুধু এই দৃশ্যটি তুলতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল সেটা বললে ফিল্ম তৈরির এলাহি কারবারটা তোমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে।

এটা সবাই জানে যে উট জিনিসটার অভাব নেই রাজস্থানে। গুপী গাইন ছবিতে হাল্লার সেনা দেখানোর জন্য উটের মালিক সমেত এক হাজার উট জোগাড় হয়েছিল মাত্র দু'-তিন দিনের চেষ্টায়। এ ব্যাপারে অবিশ্যি জয়সলমিরের মহারাজা আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। সোনার কেল্লায় আমাদের চাহিদা ছিল এর তুলনায় সামান্যই। কিন্তু মুশকিল এই যে, যে জায়গাটা শুটিং-এর জন্য বাছা হয়েছিল, তার ত্রিসীমানায় কোনও লোকালয় নেই। চারিদিকে ধূ ধূ করছে বালি, মাঝে মাঝে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ। এরই মধ্যে দিয়ে চলে গেছে মিটার গেজের লাইন; দেখলে মনে হয় যার শুরুও নেই শেষও নেই। এই রেললাইনের পাশ দিয়েই আবার চলে গেছে জয়সলমির যাবার মোটরের রাস্তা। লাইন যদি রাস্তা থেকে বেশি দূর হত তা হলে শুটিং সম্ভব হত না, কারণ জয়সলমিরে আমাদের ডেরা—সেখান থেকে মালপত্তর লোকজন নিয়ে আসতে হবে শুটিং-এর জায়গায়। উট যখন ট্রেনের দিকে ছুটে যাবে, তখন ক্যামেরাকেও ছুটতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে। তার মানে ক্যামেরাকে চাপতে হবে হুড খোলা জিপের উপর, আর তার মানেই রেললাইনের কাছাকাছি পিচ বাঁধানো রাস্তা চাই।

যোধপুর থেকে জয়সলমির পর্যন্ত দেড়শো মাইল রাস্তা চষে বেড়িয়ে একটিমাত্র জায়গা পাওয়া গেল যেখানে আমরা যা যা চাইছি তার সব কিছুই আছে। জায়গাটা জয়সলমিরের প্রায় সত্তর মাইল পুবে, যোধপুরের দিকে। উটের দলকে আসতে হবে সেখান থেকে আরও সাত মাইল পুবে খাচি নামে একটা গ্রাম থেকে। উটওয়ালাদের বলে দেওয়া হল তারা যেন উটগুলোকে সাজপোশাক পরিয়ে আনে। আমরা উটকে যে চোখে দেখি, রাজস্থানের মরুদেশের লোকেরা মোটেই সে চোখে দেখে না। উট দেখে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু তাদের পায় না। কারণ উট হল তাদের পরম বন্ধু, মরুভূমিতে একমাত্র সহায়। এই বন্ধুটিকে সাজানোর জন্য রাজস্থানীরা আদ্যিকাল থেকে যে কত রকমের

কত বাহারে জাজিম ঝালর গয়নাগাটি তৈরি করে এসেছে তার হিসেব নেই। এই সব পরে উটের দল যখন বালির উপর দিয়ে সার বেঁধে চলে, তখন তারা এই রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশে আশ্চর্য সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায়। দেখলে মনে হয় ঘোড়া বা হাতি বা অন্য কোনও জানোয়ার হলে নিশ্চয়ই এতটা মানানসই হত না। যাই হোক, উটওয়ালারা কথা দিল যে তারা দুপুরেই এসে পৌঁছে যাবে। আমাদের লোক শুটিং-এর জায়গায় অপেক্ষা করবে, নইলে উটওয়ালাদের পক্ষে জায়গা চিনে বার করার কোনও উপায় থাকবে না।

উট তো হল, এবার ট্রেনের ব্যাপার। যোধপুর থেকে একটা সকালের ট্রেন সত্তর মাইল দূরে পোকরান অবধি যায়। আমরা সেই ট্রেনটাকেই ব্যবহার করব বলে ঠিক করেছিলাম। পোকরান হল যোধপুর আর জয়সলমিরের মাঝামাঝি। আমাদের বাছাই করা জায়গাটা অবিশ্যি পোকরান ছাড়িয়ে আরও ২০ মাইল পশ্চিমে, তাও আমাদের ভরসা ছিল যে রেলের কর্তাদের বলে সেই ট্রেনটাকেই আমরা আমাদের কাজের জায়গা অবধি এগিয়ে নেব।

আমরা শুটিং-এর জোগাড় করে তৈরি হয়েছি, এমন সময় একটা ভয়াবহ ঘটনা আমাদের রক্ত জল করে দিল। কয়লার দাম বেড়ে যাওয়াতে রেলের কর্তৃপক্ষ দিনের ট্রেনটিকে এক দিনের নোটিসে দিলেন বাতিল করে! সর্বনাশ! ফেলুর দল উটের পিঠে করে ছুটে গিয়ে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করছে—আমার এই সাধের দৃশ্য কি ছবিতে স্থান পাবে না? এ হতেই পারে না।

সেই দিনই রেলের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁদের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, এই দৃশ্যটা তুলতে না পারলে আমাদের এত খরচ করে রাজস্থানে আসাটাই মাটি হয়ে যাবে। আমাদের কপাল ভাল যে কর্তাদের মধ্যে রসিক লোকের অভাব ছিল না। তাঁরা ব্যাপারটা বুঝলেন এবং বুঝে যে ব্যবস্থা করলেন তা হল এই—তাঁরা আমাদের ব্যবহারের জন্য একটি আস্ত ট্রেন দেবেন যাতে থাকবে থার্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস মেশানো ছ'টি বগি, গার্ডের গাড়ি, কয়লার গাড়ি ও ইঞ্জিন; ট্রেন চালু করতে যা কয়লা লাগবে তার খরচ দেব আমরা। ব্যাস, সমস্যা মিটে গেল। সত্যি বলতে কি, আমার মতে এটা হল শাপে বর, কারণ এ ট্রেনটা থাকবে আমাদের হাতের মুঠোয়। নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা সেটাকে নিয়ে এগোনো পিছনো থামানো চালানো যা ইচ্ছে তাই করতে পারব।

ঠিক হল পোকরান স্টেশনে এসে ট্রেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমরা জয়সলমির থেকে একশো মাইল রাস্তা মোটরে গিয়ে ট্রেনে চাপব। ট্রেন রওনা হবে আমাদের উটের দৃশ্যের জন্য বাছাই করা

জায়গার দিকে। ফেলু তোপসে জটায়ু অপেক্ষা করবে সেখানে। যাবার পথে আমরা ট্রেনের কামরায় শুটিং করব মুকুল আর বর্মনকে নিয়ে। বর্মন মুকুলকে নিয়ে জয়সলমির যাবার পথে ঝিমিয়ে পড়েছে, আর মুকুল তন্ময় হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

এ ছাড়া যাবার পথে আরও একটা জিনিস তোলার ইচ্ছে আছে। ক্যামেরা নিয়ে কয়লার গাড়িতে গিয়ে চাপব, সেখান থেকে ইঞ্জিনের ছবি তুলব—সামনেই চোঙা দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আর তার মধ্যে দিয়ে সমান্তরাল রেললাইন একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে।

প্রথম গণ্ডগোলটা হল পোকরানে। ট্রেন আসার কথা এগারোটার সময়, এল আড়াইটার পর। কাজের সময় যেখানে আগে থেকে হিসেব করে ভাগ করা থাকে, সেখানে দশ-পনেরো মিনিট এদিক ওদিক হলেই হিমসিম খেতে হয়, আর এ তো তিন ঘণ্টার ব্যাপার। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করলে আরও মূল্যবান সময় নষ্ট হবে, তাই আমরা চটপট মালপত্র নিয়ে কামরায় উঠে গাড়ি চালু করে দিলাম।

মুকুল আর বর্মনকে নিয়ে কামরার ভিতরের কাজটা নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে গেল। তারপর গাড়ি থামিয়ে আমরা জনা তিনেক গিয়ে উঠলাম কয়লার গাড়িতে। সেখানে কয়লার স্তূপ ছাড়া কিছুই নেই, তাই সেই স্তূপের ওপরেই দাঁড়িয়ে ক্যামেরা হাতে নিয়ে রেডি হয়ে আবার ট্রেন চালু করে দেওয়া হল। ক্রমে গাড়ির স্পিড বাড়লে পর ক্যামেরাও চলতে শুরু করল। ইঞ্জিনে ড্রাইভার ছাড়াও আর একজন লোক থাকে, সে হল স্টোকার। তার কাজ হল একটি অতিকায় খোন্তায় কয়লা তুলে বয়লারে ঢালা। ঢাললেই বয়লারের আগুন গন গন করে জ্বলে ওঠে, আর সেই সঙ্গে চোঙা দিয়ে ভস ভস করে কালো ধোঁয়া বেরোয়।

আমার হাতে ক্যামেরা, কয়লার উপর পা দিয়ে কনুই দুটোকে ইঞ্জিনের ছাতে ভর করে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছি। তারই মধ্যে কেন যে মাঝে মাঝে পা হড়কে টাল হারিয়ে ফেলছি সেটা বুঝতে পারছি না। শট্ নেওয়ার পরে বুঝলাম, আমি কয়লার স্তূপের সামনের দিকে দাঁড়ানোর ফলে স্টোকারবাবু বাধ্য হয়ে আমার ঠিক পায়ের তলা থেকেই কয়লা তুলে নিচ্ছিলেন। বুঝলাম একেই বলে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়া!

এই কয়লার গাড়িতে করেই আমরা উটের শুটিং-এর জায়গায় পৌঁছে গেলাম। উট সমেত বাকি দল সেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কেবল যে জিনিসটি না হলে ছবি তোলা যায় না, সেটিকে আর ধরে রাখা যায়নি। সেটি হল সূর্যের আলো। পশ্চিম দিগন্তে মামার আধখানা উঁকি মারছে, নতুন জায়গায় ক্যামেরা বসাতে বসাতে তিনি যে একেবারেই ডুব দেবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

উট, ট্রেন, সব যে যার ঘরে ফিরে গেল, তবে যাবার আগে ঠিক হয়ে

BDeBooks.com

গেল পরদিন আমরা আবার এই একই জায়গায় জমায়েত হচ্ছি দুপুর আড়াইটার সময়। ট্রেনও পোকরানে না থেকে সোজা চলে আসবে এইখানে।

আগেই বলেছি যে আমাদের ডেরা ছিল জয়সলমিরে। মুকুলের সোনার কেল্লা থেকে আধ মাইল দূরে একটি ছোটখাটো প্রাসাদের মতো গেস্টহাউসে আমাদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন ভোরে উঠে আমরা প্রথমে গেলাম কেল্লার ভিতরে শুটিং করতে। ঘণ্টা তিনেক ধরে সেখানে ছবির শেষ দৃশ্যের কিছু শট্ নেওয়া হল। তারপর তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা আড়াইটার মধ্যে গিয়ে হাজির হলাম উটের শুটিং-এর জায়গায়।

গিয়ে দেখি উটের দল আগেই হাজির। এবার শুধু ট্রেন আসার অপেক্ষা। গতকালের গণ্ডগোলটাও যে শাপে বর হয়েছে সেটা বুঝলাম আকাশের চেহারা দেখে। সাদা আর ছাই রঙের টুকরো টুকরো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে, আর তারই ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে সোনালি রোদ এসে পড়েছে মরুভূমির উপর। নাটকীয় দৃশ্যের পক্ষে এমন মানানসই নাটকীয় আলো গতকাল ছিল না।

আজ ট্রেনও এসে হাজির হল ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সকলেরই বুক ধুকপুক করছিল, কারণ কাল সকালেই জয়সলমির ছেড়ে চলে যেতে হবে যোধপুর, আর কালই সন্ধ্যায় আমরা তলপি-তলপা গুটিয়ে রাজস্থান ছেড়ে ঘরমুখো রওনা হব। হঠাৎ যখন কানে এল ঝুক্ ঝুক্ শব্দ, তখন সবাই একসঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

ট্রেন এসে থামবার পর ড্রাইভারকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তাকে পিছিয়ে যেতে হবে সিকি মাইল। সেখান থেকে আবার রওনা হয়ে ট্রেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে, সময় বুঝে আমরা সওয়ার সমেত উটের দলকে রওনা করিয়ে দেব। ক্যামেরা থাকবে হুড খোলা জিপের উপর, পিচের রাস্তা দিয়ে জিপ ঠেলে ক্যামেরাকেও উটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড় করানো হবে ট্রেনের দিকে।

ড্রাইভারকে সবই বোঝানো হয়েছিল, কেবল একটি জিনিস বাদে— যার ফলে আমাদের প্রথম বাজি ভেস্তে গেল। ট্রেন আসছে, উট ছুটছে, ক্যামেরাও ছুটছে ; ট্রেন উটের কাছাকাছি এসে গেলে পর ফেলু যেই পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত নেড়েছে, অমনি ঘ্যাঁ-চ করে ব্রেক কষে ট্রেন থেমে গেল। ড্রাইভারকে জিগ্যেস করতে বলল, 'বাবু যে আমায় থামবার জন্য ইশারা করল, তাইতো থামলাম'। ড্রাইভার বেচারা তো আর জানে না যে ও জিনিসটা করলে গল্পের ঘটনা একেবারে উলটিয়ে যায়! পিছোও, পিছোও— ট্রেন পিছোও, আবার সেই সিকি মাইল দূরে। উট পিছোও, ফেলু তোপসে লালমোহন পিছোও, জিপ

ক্যামেরা সব পিছোও, আবার সব শুরু থেকে নতুন করে হবে। এবারে নিশ্চয়ই আর কোনও গণ্ডগোল হবে না।

ট্রেন আবার রওনা হল। ওই যে শব্দ শোনা যাচ্ছে, ওই এসে পড়ল বলে। উটের দলকে ইশারা করে দেওয়া হল। জিপকে ঠেলার জন্য সার বেঁধে লোক তৈরি। এক ঠেলায় একদফা ঘাম ছুটে গেছে তাদের ; এবার দ্বিতীয় দফা।

ক্যামেরা চালু করার জন্য 'স্টার্ট' কথাটা বলতে গিয়ে জিভে আটকে গেল। ট্রেন তো আসছে, কিন্তু ধোঁয়া কই? মরুপ্রান্তরের বিশাল ঝলমলে আকাশ ট্রেনের মিশকালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে—এ না হলে দৃশ্যটা জমবে কী করে? থামাও থামাও, ট্রেন থামাও, উট থামাও, জিপ থামাও!

দলের যত লোক যে যার কাজ ফেলে দুহাত তুলে ট্রেনের দিকে ছুটে গেল। রোক্‌কে, রোক্‌কে!

ঘ্যাঁ-চ করে ট্রেন আবার ব্রেক কষল।

স্টোকারবাবু নিজে শুটিং দেখার জন্য এত উদ্‌গ্রীব যে বয়লারের কয়লা দিতে ভুলেই গেছেন— ধোঁয়া আর হবে কোত্থেকে? এবার কিন্তু কয়লা দেওয়া চাইই চাই। তৃতীয়বার ভুল হলে আমরা পথে বসব, কারণ চারবারের বার আর আলো থাকবে না। স্টোকারের খেয়াল খুশির উপর নির্ভর না করে এবার ইঞ্জিনে আমাদের নিজেদের একজন লোক রেখে দিলাম।

ফেলু, তোপসে আর জটায়ু উটের পিঠে চড়ে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। বার বার তিনবার শট্ নেওয়াতে একটা লাভ হবে জানি—সওয়ারদের আর দম বেরোনোর অভিনয় করতে হবে না। জটায়ুর অবস্থা তো দেখছি এর মধ্যেই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কিন্তু দৃশ্যটা যাতে ভালভাবে তোলা হয় তা জন্য সবাই সমান ব্যগ্র, তাই পরিশ্রম হলেও কেউ সেটা গায়ে মাখছে না।

তিনবারের পর আর কোনও দিক দিয়ে কোনও গণ্ডগোল না হওয়াতে দৃশ্যটা নিখুঁতভাবে তোলা হয়ে গেল।

কিন্তু তার মানেই যে সেদিনের কাজ শেষ হয়ে গেল তা নয়। এই একই ট্রেন আমাদের আবার প্রয়োজন হবে আজই রাত্রে দশটার সময়। রামদেওরা স্টেশনের দৃশ্য! মাঝরাত্তিরে জয়সলমিরের ট্রেন এল, ফেলু তোপসে লালমোহন ট্রেনে চাপল, আর ট্রেন ছাড়া মাত্র রাজস্থানির ছদ্মবেশে মন্দার বোস দৌড়ে গিয়ে ফেলুদের কামরার দরজার হাতল ধরে ঝুলে পড়ল।

সে হল আরেক পর্ব।

ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে

সেবার অপু, এবার ফেলু। আজ থেকে বাইশ বছর আগে বেনারসে শুটিং করতে যাই অপরাজিত ছবির। তখন কাশীর অলিগলি ঘাট-মন্দির গরু-বাঁদর সাধু-সন্ন্যাসী সবই দেখানো হয়েছিল অপুর চোখ দিয়ে। এবারও সেই একই কাশী, কিন্তু ঘটনা একেবারে আলাদা। জয় বাবা ফেলুনাথ-এ কাশী হল রহস্যের পটভূমিকা। ফেলুদা সেখানে ছুটি ভোগ করতে এসে চুরি আর খুনের তদন্তে জড়িয়ে পড়ছে। কাজেই কাশীকে এবার দেখতে হবে অন্য চোখ দিয়ে।

কাশী যারা দেখেনি, এ শহরের মজা তাদের বলে বোঝানো ভারি শক্ত। গঙ্গার ঘাট কলকাতাতেও আছে, গলিও আছে শ্যামবাজারে, বাগবাজারে, বড়বাজারে। কিন্তু কাশীর মতো ঘাট আর গলি কাশী ছাড়া আর কোথাও নেই।

আগে ঘাটের কথাই বলি। দক্ষিণে অসিঘাট থেকে সুরু করে উত্তরে রাজঘাট পর্যন্ত কত ঘাট যে পর পর সাজানো রয়েছে কাশীর গঙ্গার ধারে তার কোনও হিসেব নেই। এই সব ঘাটের নামে, আর তার আশেপাশে প্রাসাদ আর বাড়িগুলোতে কাশীর বিচিত্র ইতিহাসের একটা চেহারা পাওয়া যায়। যেমন দক্ষিণপ্রান্তে হরিশচন্দ্র ঘাট। এটা হল কাশীর দুটো বড় শ্মশানের একটা। পুরাণের রাজা হরিশচন্দ্র কাশীতে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে রোহিতকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রী করে এক বছর এই শ্মশানে এক চণ্ডালের দাস হয়েছিলেন। হরিশচন্দ্রঘাটের কিছু পরেই তুলসীঘাট। ঘাটের উপরেই একটা বাড়িতে বসে তুলসীদাস তাঁর বিখ্যাত হিন্দি রামায়ণ লিখেছিলেন। তুলসীর উত্তরে শিবালা ঘাটের উপর রয়েছে রাজা চৈত সিং-এর প্রাসাদ। ওয়ারেন হেস্টিংস এই রাজাকে গ্রেপ্তার করতে এলে চৈত সিং তাঁর প্রাসাদের জানালা দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে

রেহাই পান।

চৈত সিং ছাড়াও আরও অনেক রাজা-রাজড়া তাঁদের প্রাসাদ ঘাটের উপর তৈরি করাতে এই সব ঘাটের নামকরণ রাজাদের নামেই হয়ে গেছে। মানসরোবর ঘাট অম্বরের রাজা মানসিংহের তৈরি, রাণাঘাট উদয়পুরের রাণার তৈরি, অহল্যাঘাট তৈরি করেছিলেন ইন্দোরের রানী অহল্যাবাই। মানমন্দির ঘাট যে কারণে প্রসিদ্ধ, সেই আড়াইশো বছরের পুরনো মানমন্দিরটি তৈরি করেছিলেন জয়পুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়সিংহ। এ ছাড়া দুটো বিখ্যাত ঘাটের নাম তোমরা সকলেই জান ; এক হল মনিকর্ণিকা, যেখানে কাশীর আসল শ্মশান, আর আরেক হল দশাশ্বমেধ, যেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা নাকি পর পর দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই দশাশ্বমেধেই দেখা যায় কাশীর বিখ্যাত ছাতা। পাণ্ডারা যে তক্তপোষে বসে তারই উপর রাখা একটা পাথরের মাঝখানে একটা গর্তের ভিতর ছাতার বাঁটটা ঢুকিয়ে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ছাতাটাকে ইচ্ছামতো ঘুরিয়ে সারাটা দিনই ছায়ার ব্যবস্থা করা যায়। এই মার্কামারা বিশাল বাঁশের ছাতা আমি বেনারস ছাড়া আর কোথাও দেখিনি।

আর গলি ? গলির সেরা হল অবিশ্যি বিশ্বনাথের গলি। চার হাত চওড়া এই গলি দশাশ্বমেধ রোড থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে উত্তরে চলে গেছে সোনার পাতে মোড়া চুড়োওয়ালা বিশ্বনাথের মন্দির পর্যন্ত। এই গলির দুদিকে সারবাঁধা দোকান, সেখানে রাজ্যের জিনিস পাওয়া যায়। তবে বেনারসের দুটি বিখ্যাত জিনিস মিঠাই আর কাঁসার বাসন পেতে হলে যেতে হবে অন্য গলিতে। রাবড়ি মালাই পাওয়া যাবে কচৌরি গলিতে আর কাঁসার জিনিস পাওয়া যাবে ঠঠেরি বাজারের গলিতে। একবার বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকলে বড় রাস্তায় না বেরিয়েও শুধু গলিপথ দিয়েই এই সব অন্য গলিতে পৌঁছনো যায়। কাশীতে এমন অনেক গলি আছে যেখানে সারা বছরের কোনও সময়েই সূর্যের আলো পৌঁছয় না। অনেক ধনী লোকের হাভেলি বা অট্টালিকা এই সব অন্ধকার গলিতে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের গল্পের 'ভিলেন' মগনলাল মেঘরাজের বাড়িও খুঁজতে হবে এই রকম একটা অন্ধকার গলিতে। এই সব বাড়ির এক-একটা চার পাঁচতলা উঁচু। সব বাড়িরই মাঝখানে উঠোন, আর এই উঠোনের উপর দিকে চাইলে দেখা যাবে এক ফালি চৌকো আকাশ। এই আকাশটুকু আছে বলেই রক্ষে, নইলে এসব বাড়িতে অষ্টপ্রহর বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হত।

কাশীতে দেড়লাখ বাঙালির মধ্যে বেশির ভাগই থাকে বাঙালিটোলার গলিতে। দশাশ্বমেধ রোডের উত্তরে হল বিশ্বনাথের গলি, আর দক্ষিণে হল বাঙালিটোলা। কাশীতে সব সময়ই এত বাংলা কথা শোনা যায়,

রাস্তার দেয়ালে আর দোকানের গায়ে এত বাংলা হরফ দেখা যায়, যে এক এক সময় মনে হয় বুঝি বাংলাদেশের কোনও শহরে এসে পড়েছি। একটা মজা এই যে এখানকার বাঙালির কথায় পশ্চিমা টান প্রায় নেই বললেই চলে— যদিও এখানে এমন অনেক বাঙালি পরিবার আছে যারা আট দশ পুরুষ ধরে কাশীতেই রয়েছে। চৌখাম্বার মিত্তিররা তো রয়েছেন প্রায় চারশো বছর ; অর্থাৎ সেই মোগল আমল থেকে। এই মিত্তিরদের বাড়ির দুর্গাপুজো এখানকার সবচেয়ে পুরনো পুজো। এদের দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক আর গণেশ আলাদা আলাদা ডুলিতে করে ঘাটে নিয়ে গিয়ে ভাসান দেওয়া হয়। বাড়ি হল গলির মধ্যে, বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার জো নেই, ভিতরে গেলে দেখা যায় মহলের পর মহল জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

এই কাশীর ঘাটে আর গলিতে ঘুরে ঘুরে ফেলুদাকে রহস্যের সমাধান করতে হবে। শুটিং করার আগে জায়গাটাকে একবার ভাল করে ঘুরে দেখে নিতে হয়, কোন কোন জায়গায় কাজ হবে, সেখানে কোন সময় কেমন আলো থাকে, সেই আলোয় ছবি তোলা যায় কিনা, সেখানকার লোকজন আপত্তি করবে, না সহায়তা করবে। আগে থেকে জেনে না এলে পরে কাজের অসুবিধা হয়। শুটিং শুরু করার আগেই তাই আমরা তিনদিনের জন্য কাশী গেলাম জায়গাটাকে সার্ভে করতে আর স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে।

জয় বাবা ফেলুনাথ-এর ঘটনা পুজোর পাঁচটা দিনে ঘটছে। গল্পে দুর্গা প্রতিমার একটা ব্যাপার আছে ; সেই প্রতিমা আমাদের গড়াতে হবে কাশীতেই। আমরা প্রথম দিনই রওনা দিলাম বাঙালিটোলার গণেশ মহল্লার উদ্দেশে, কারণ জানতাম যে সেখানে কয়েক ঘর কুমোর বাস করে। এখানে গোধুলিয়ার মোড়ের কথাটা না বললে চলে না, কারণ এই গোধুলিয়া থেকে বেরোনো চারটে রাস্তার একটা ধরেই গণেশ মহল্লায় যেতে হয়। কলকাতায় যেমন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় বা ধরমতলা-চৌরঙ্গির মোড়, তেমনি কাশীর হল গোধুলিয়ার মোড়। রাস্তায় লোক চলাচলটা যখন একটু জমে উঠেছে, তেমন একটা সময় এই গোধুলিয়ার মোড়ে হাজির হলে মনে হবে কাশীর আঠারো হাজার সাইকেল রিকশার সব কটাই যেন একসঙ্গে সেখানে মিলে চতুর্দিকে একরাশ সচল ও সশব্দ পাঁচিলের সৃষ্টি করেছে, যেগুলো ভেদ করে পথচারীর রাস্তা পেরোনোর কিছুমাত্র আশা নেই। আর শুধু যে সাইকেল-রিকশা তা তো নয়, তার সঙ্গে মানুষ গরু টাঙ্গা মোটরগাড়ি আর এমনি দু-চাকার সাইকেল। এই জনসমুদ্র আর যানসমুদ্রের মধ্যে লাল পাগড়িধারী (যেমন আগে কলকাতায় ছিল), পুলিশকে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করতে, কিন্তু সেদিকে বিশেষ কেউ দৃকপাত

করে না। বোঝা যাচ্ছে পুলিশও তার কাজটাকে বেশ হালকাভাবেই নেয়, কারণ তাদের কট্যাক্ষপাতের মতো অনেক ঘটনাই রাস্তায় হামেশাই ঘটছে— মোটরগাড়ি সাইকেল-রিকশাকে ধাক্কা মারছে, সাইকেল রিকশা মারছে সাইকেলকে অথবা মানুষকে— অথচ কেউই তাতে খুব একটা বিচলিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। পুলিশ তো নয়ই।

এই গোধুলিয়ার চৌমাথা থেকে যে রাস্তাটা দক্ষিণে চলে গেছে সেটা দিয়ে মাইল দেড়েক গিয়ে বাঁয়ে পড়ে গণেশ মহল্লার গলির মুখ। সেখানে আমাদের ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আমরা গলির ভিতর প্রবেশ করলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই কয়েকটি স্থানীয় বাঙালি ছেলে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ল। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন— 'কী বইয়ের শুটিং হবে দাদা ?' (ফিল্মের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'বই' কথাটা বাঙালিদের মধ্যে যে কী করে চালু হল এটা আমার কাছে একটা রহস্য। 'বই'য়ের বদলে 'ছবি' বলতে আপত্তি কী ?) সকলেরই শুটিং দেখার আগ্রহ, অথচ ব্যাপারটা কিন্তু আসলে বেশ ক্লান্তিকর, কারণ ছবিতে যে দৃশ্য হয়তো এক মিনিট চলবে সেটা তুলতে অনেক সময় লেগে যায় এক ঘণ্টারও বেশি। কিন্তু এই কথাটা বলেও আগ্রহটা দাবিয়ে রাখা যায় না। যাই হোক, এরা যখন এখানকার লোক, তখন এদের সাহায্য নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কুমোরের কথা জিগ্যেস করাতে তারা বলল— চলুন ফেলুদার বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি। কথাটা শুনে ভাবলাম এরা বুঝি ঠাট্টা করছে। ফেলুদার সঙ্গে কুমোরের কী সম্পর্ক ? শেষটা কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়। গণেশ মহল্লায় সত্যিই এক ঠাকুর-গড়িয়ে থাকেন যাঁর ডাক নাম ফেলু। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপও হল। নিরীহ মানুষ, একগাল দাড়ি, যদিও বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, 'আমার নামটার জন্য টিটকিরি সহ্য করতে হয়। ফেলুদার গল্প এখানে অনেকেই পড়ে।'

কুমোরের নাম ফেলুদা হওয়াটা খুবই আশ্চর্য ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু শুটিং করতে গিয়ে এরকম ঘটনা আগেও অনেকবার ঘটেছে। অপরাজিত ছবি তুলতে বেনারসে আসার পরদিনই একটি বাঙালি ছেলে আমাদের সঙ্গ নেয় যার ভাল নাম অনুপম আর ডাক নাম অপু। তার পরের বছর নিমতিতার পদ্মার ধারে চৌধুরীদের বাড়িতে জলসাঘর ছবি তুলতে গিয়ে দেখি সে বাড়ির এক ছোকরা চাকরের নাম তুফান। জলসাঘরের জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের প্রিয় ঘোড়ার নামও তুফান। আরও আশ্চর্য এই যে খান দশেক পুরনো জমিদার বাড়ি দেখে বাতিল করে শেষটায় নিমতিতার চৌধুরীবাড়ি দেখে যেই সেটা পছন্দ হয়ে গেল তখন শুনলাম যে এই বাড়িরই এক জমিদারের কথা শুনে তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র তৈরি করেছিলেন।

ফেলু পটুয়া ছাড়া আরেকজন পটুয়ার সঙ্গে এই প্রথমদিনেই আলাপ হল যাঁর নাম বংশী পাল। জয় বাবা ফেলুনাথ-এর পটুয়ার নাম দিয়েছিলাম শশী পাল। এই কাছাকাছি মিলটাও বেশ আশ্চর্যের।

কুমোর ছাড়া আরও দুটো জিনিস আমাদের দরকার ছিল শুটিং-এর জন্য। এক হল গল্পের ভণ্ড সাধু মছলিবাবার জন্য ঘাটের ধারে-কাছে একটি গোপন আস্তানা ; আর দুই হল, যে ঘোষালদের আড়াই ইঞ্চি লম্বা সোনার গণেশ চুরি নিয়ে রহস্য, তাদের জন্য মানানসই একটা পুরনো বাড়ি। প্রথম দিনে গলি দেখা শেষ করে পরদিন সূর্য ওঠার আধ ঘণ্টা আগে আমরা ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম। অনেক ঘাট ঘুরে দেখতে হবে বলে আমরা ট্যাক্সি করে হরিশচন্দ্র ঘাটে গিয়ে সেখান থেকে উত্তরে দশাশ্বমেধের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। সোজা ঘাট ধরে হাঁটলে মাইল দুয়েক পথ, কিন্তু আমাদের প্রায়ই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আশে-পাশের বাড়িগুলো দেখতে হচ্ছে। দশাশ্বমেধের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন সূর্য বেশ খানিকটা উঠে গেছে। সেদিন আবার ছিল মকরসংক্রান্তির স্নান। আসল স্নান দশাশ্বমেধে, কিন্তু লোকের ভিড় উপচে পৌঁছে গেছে আরও দুটো ঘাট এদিকে ওদিকে। এইসব স্নানার্থীদের মধ্যে আবার হিপিরা ঘোরা-ফেরা করছে ; কেউ দোকান থেকে চা কিনে খাচ্ছে, কেউবা ঘাটের সিঁড়িতে বসে পিড়িং পিড়িং করে সেতার বাজাচ্ছে, আবার কেউ এই সাত সকালেই গাঁজায় দম দিতে শুরু করেছে। গঙ্গার উপর দিয়ে বিদেশি টুরিস্টে বোঝাই বজরা ভেসে চলেছে। অনেকের হাতেই মুভি ক্যামেরা। তারা সাগ্রহে ফিল্ম তুলে চলেছে এই তাজ্জব দৃশ্যের।

দশাশ্বমেধের ঠিক পাশেই দক্ষিণে হল দ্বারভাঙা ঘাট। ঘাট থেকে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে দ্বারভাঙার রাজার প্রাচীন প্যালেসের দরজা অবধি। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। কলকাতার মানুষ, অতগুলো বেয়াড়া সিঁড়ি ভাঙতে বেশ পরিশম হয়, অথচ এখানকার আশি-বিরাশি বছরের বুড়ো বুড়িরা কত কাল ধরে সকাল সন্ধে দিব্যি এই সিঁড়ি দিয়ে উঠছে নামছে সেটা ভাবতে অবাক লাগে। এই দ্বারভাঙার সিঁড়ির পাশেই একটা আটকোণা বুরুজে পায়রাদের দানা দেওয়া হয় রোজ সকালে-বিকালে। শ'য়ে শ'য়ে পায়রার ঝাঁক এসে নামে এই বুরুজের উপর। এ দৃশ্য বাইশ বছর আগেও দেখেছি, এবারও দেখলাম। কীভাবে এই পায়রাকে ছবিতে কাজে লাগানো যাবে সেটাও মাথায় এসে গেল।

দ্বারভাঙা প্যালেসের দরজায় তালাচাবি লাগানো। একজন দারোয়ান রয়েছে, সে বলল প্রবেশ নিষেধ। অথচ বাইরে থেকে দেখে ভিতরে ঢোকার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে। বুঝতে পারছি প্যালেসে কেউ থাকে না, কাজেই মছলিবাবার গোপন ডেরা সেখানে হলেও হতে পারে। সুখের বিষয়, দুটো টাকা বকসিশ দিতেই দারোয়ান চাবি এনে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকতেই বুকের ভিতর ধুকপুকুনি সুরু হয়ে গেল আর মন বলল যে আর কোনও বাড়ি দেখতে হবে না, যা চাইছিলাম তা পেয়ে গেছি। গঙ্গার উপরে মোগলাই কাজ করা এই প্রাচীন পরিত্যক্ত প্রাসাদেই শুটিং করতে হবে, এবং সে কাজের জন্য অনুমতি যেখান থেকে হোক জোগাড় করতেই হবে।

প্যালেসের প্রথম তলাটাই ঘাট থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত উপরে। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমে পড়ে একটা খোলা বারান্দা। তার রেলিং-এর ধারে গিয়ে নীচের দিকে চাইলে ঘাটের মানুষগুলোকে খুদে খুদে দেখায়। ঘাটের শব্দও এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। উত্তরে চাইলে দেখা যাচ্ছে রেলের ব্রিজ, আর দক্ষিণে ওপারে রামনগরের কেল্লার সামনে দিয়ে গঙ্গাটা বাঁক নিয়ে পুবমুখো হয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে।

প্রথম বারান্দা পেরিয়ে দ্বিতীয় বারান্দায় ঢুকে ডাইনে খিলান পেরিয়ে প্রাসাদের ভিতর গিয়ে ঢুকলাম। এখানেও বারান্দায় ঘেরা ছাতখোলা উঠোন। বাঁয়ে এক কোণে একরাশ পুরনো আসবাব ডাঁই করা হয়েছে। ডাইনে অন্ধকার দরজা দিয়ে ঢুকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দিনের বেলায় টর্চ জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই মছলিবাবার ঘর পেয়ে গেলাম। ক্যামেরায় দেখালেই বোঝা যাবে এ বাড়িতে কস্মিন কালে কেউ আসে না ; কাজেই গোপন ডেরার পক্ষে চমৎকার জায়গা। জায়গা বেছে নিয়ে প্যালেস থেকে বেরোবার সময় একটা আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়ল। সেটা একটা বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট। বিদ্যুতের অভাবে সেটা অবিশ্যি এখন অচল, কিন্তু রাজার আমলে যখন চলত, তখন সেটা প্রাসাদের চার তলা অবধি ওঠা-নামা করত। চার তলায় কালীমন্দির। রাজা স্নান সেরে লিফ্‌টে উঠে বোতাম টিপে সোজা পৌঁছে যেতেন পুজোর ঘরে।

মছলিবাবার ডেরা তো পাওয়া গেল, আর সেই সঙ্গে প্যালেসে শুটিং করার অনুমতিও আদায় করে নেওয়া হল। এবার বাকি ঘোষালদের বাড়ি। খোঁজ করে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী দুটো বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। একটা মেমুরগঞ্জের সাহাদের বাড়ি। গিয়ে দেখলাম মোটামুটি গল্পের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু তার আশেপাশে বেনারসের কোনও চিহ্ন নেই। এখানে শুটিং করাও যা কলকাতাতেও তাই। এ বাড়ি বাতিল করে আমরা চলে গেলাম নাগওয়া। এই নাগওয়ার ঘাট থেকেই

সাঁকো পেরিয়ে রামনগর যায়। নাগওয়ার যে অংশে বাড়ি দেখব, সেটার নাম লঙ্কা। বাড়ির মালিক ছিলেন উত্তর প্রদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলর জ্ঞান চক্রবর্তী। তিনি মারা গেছেন অনেককাল ; এখন বাড়ি চলে গেছে ডালমিয়াদের হাতে। গেট দিয়ে ঢুকে বেশ কিছুটা হাঁটার পর গাছপালার আবরণ সরে গিয়ে বাড়িটা দেখা যায়। বিশাল অট্টালিকা। কেউ থাকে না এখন তাতে। চারদিকে বিস্তীর্ণ জমি, এককালে বেশ রমরমা ছিল সেটা দেখেই বোঝা যায়। ঘোষালবাড়িই বটে। পাশেই গঙ্গা, তবে বর্ষায় জল বাড়লেও এ বাড়ির একতলা অবধি পৌঁছবে না, কারণ ভিত প্রায় দশ হাত উঁচু, প্রথম তলায় পৌঁছতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়। জমিটা ছিল নাকি এক মেমসাহেবের। তাঁর সঙ্গে এই জ্ঞান চক্রবর্তীর আলাপ হয়। তার অল্পদিন পরেই মেমসাহেব স্বপ্নে জানেন যে পূর্বজন্মে জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর নিজের ছেলে। অনেকদিন কাশীতে থেকে ভদ্রমহিলার হিন্দু ধর্মের প্রতি টান হয়, পূর্বজন্ম-টন্ম সম্বন্ধেও বিশ্বাস জন্মায়। এই স্বপ্ন দেখার ফলে মেমসাহেব তাঁর জমিজমা সম্পত্তি সব কিছু চক্রবর্তীমশাইকে দান করে যান। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে চক্রবর্তীমশাই বাড়িটি তৈরি করেন আর উনিশ শো আটাত্তর সালে সেখানে হবে ফেলুদার ছবির শুটিং।

বাড়ির মধ্যে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি তাক লাগিয়ে দেয় সেটা হল ছাত। এই ছাতে বেশ কিছু দৃশ্য তুলতে হবে, কারণ ছাতেই হল গল্পের খুদে নায়ক রুক্মিণীকুমার বা রুকুর খেলার ঘর। যেমন ঘর গল্পে ছিল, ঠিক তেমনই একটা ঘর রয়েছে ছাতের সিঁড়ির ঠিক ডান দিকে। এই ঘর থেকে বেরিয়ে আরও চার ধাপ সিঁড়ি উঠে তবে আসল ছাত। কাশীর যে দৃশ্য দেখা যায় এই ছাত থেকে তার কোনও তুলনা নেই। সুদূরে রেলের ব্রিজ অবধি বিছিয়ে রয়েছে বেনারসের উপকূল, কাস্তের ফলার মতো গোল হয়ে বেঁকে গেছে এ মাথা থেকে ও মাথা। সকালের কুয়াশায় দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, কিন্তু বেলা বাড়লে কুয়াশা কেটে ক্রমে পুরো শহরটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দক্ষিণে গঙ্গার পাড় অবধি সমস্ত জমিটাই ছিল চক্রবর্তীদের। সেই জমিতে এখন অড়হর আর গাঁদা ফুলের চাষ হয়েছে। শুনলাম শহরের পুজোর বেশির ভাগ গাঁদাই এখান থেকে যায়।

ঘোষালদের জন্য এত ভাল আর এমন জুতসই একটা বাড়ি পাওয়াতে মনটা নেচে উঠেছিল, তার পর যখন জানলাম যে এখানে শুটিং করার অনুমতি পেতে কোনও অসুবিধা হবে না, তখন আনন্দের সঙ্গে পরম নিশ্চিন্তির ভাব নিয়ে তিন দিনের কাশীবাস শেষ করে কলকাতায় ফিরলাম। কলকাতায় দিন কয়েক থাকা ; তার মধ্যে একটা বড় কাজ

হল রুকুর জন্য একটি নতুন ছেলে জোগাড় করা। শুটিং শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ই।

* * *

বেনারসে যখন শুটিং-এর জন্য জায়গা খুঁজতে আসি, তখন আমরা ছিলাম পাঁচজন। আমি ছাড়া ছিল আমার ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু, শিল্প-নির্দেশক অশোক (যাকে কলকাতার স্টুডিওতে বেনারসের ঢং-এ ঘরবাড়ি তৈরি করতে হবে), অন্যতম সহকারী পুনু সেন আর প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিলবাবু। এই শেষ জনের কাজ হল সব খোঁজখবর নেওয়া, শুটিং-এর অনুমতির জন্য তদ্‌বির করা, খরচের হিসাব রাখা ইত্যাদি।

শুটিং-এ যখন যাই, তখন দলে থাকে অনেক লোক। এবারে যেমন কুলি-মজুর বাদে ছিল তেইশ জন। পুরো একটা বগি রিজার্ভ করে সবাই একসঙ্গে এক গাড়িতে যাওয়া আমাদের রীতি। অভিনেতাদের মধ্যে শুধু ফেলুদা ছিল আমাদের সঙ্গে। বাকিরা তাদের যেদিন থেকে দরকার ঠিক আগের দিন পৌঁছলেই চলবে। এদের সবাইকে ঠিক ঠিক দিনে ট্রেনে তুলে দেবার দায়িত্ব পালন করার জন্য অনিলবাবু কলকাতায় রয়ে গেলেন।

জয় বাবা ফেলুনাথ-এর খুদে চরিত্র ৭ বছরের রুকুর জন্য ছেলে খুঁজতে হবে আগেই লিখেছি। সেই ছেলেকে পেলাম যেদিন রাত্রে দুন এক্সপ্রেসে কাশী রওনা হব সেদিন দুপুরে। একটি ছেলেকে আগে দেখা হয়েছিল ; তার একটা স্ক্রিন-টেস্ট নিয়ে দেখা গেল তার বয়স আট হলেও পর্দায় তাকে প্রায় দশ বলে মনে হচ্ছে। সেটা রুকুর পক্ষে একটু বেশি বলে ভাল অভিনয় সত্ত্বেও ছেলেটিকে বাদ দেওয়া হল। নতুন লোক নিতে গেলে অনেক সময়ই স্ক্রিন-টেস্ট করে নিতে হয়। যার টেস্ট হবে তাকে চরিত্র-অনুযায়ী খানিকটা ডায়লগ দিয়ে দিতে হয়। সেটা মুখস্থ করে ক্যামেরার সামনে পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী অভিনয় করে। সেই অভিনয় পর্দায় দেখে বিচার করা হয় বাছাই ঠিক হয়েছে কিনা। এটা সব সময় চোখে দেখে সম্ভব হয় না, কারণ মানুষের চোখ যা দেখে, ক্যামেরার চোখ দেখে তার চেয়ে বেশি। একজন লোক যখন সাধারণভাবে কথাবার্তা বলে, বিশেষ কারণ না থাকলে আমরা কখনওই তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি না। ক্যামেরা কিন্তু ঠিক এই কাজটাই করে। এই নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার ফলটা যখন আমরা পর্দায় দেখি অভিনয়ের সূক্ষ্ম দোষগুলি চট্ করে ধরা পড়ে। তেমনি আবার অনেক সময় চোখে দেখে যাকে খুব সাধারণ বলে মনে হয়, ক্যামেরায় সূক্ষ্ম গুণ ধরা পড়ে এই সাধারণকেই অসাধারণ করে তোলে।

রুকুর জন্য বাছাই করা ছেলে টেস্টে বাদ পড়ে যাওয়াতে আমাদের খুবই মুশকিল পড়তে হয়েছিল। ছেলে আসছে অনেক, কিন্তু কাউকেই পছন্দ হয় না। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে, শুটিং-এর তারিখ বাঁধা, হোটেল আর ট্রেনের বুকিং হয়ে গেছে। যেদিন রাত্তিরে দুন এক্সপ্রেসে রওনা দেব, সেদিন সকালে সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার সহকারী পুনু টালিগঞ্জ থেকে ফোন করে উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল, একটি ছেলেকে সে একটা দোকানের সামনে দেখে তার পিছনে ধাওয়া করে তার মা-র সঙ্গে কথা বলে জেনেছে যে আমার পছন্দ হলে আমরা সে ছেলেকে ছবিতে ব্যবহার করতে পারি। আমি বলাতে আধঘন্টার মধ্যে ট্যাক্সি করে মা ও ছেলে হাজির হয়ে গেলেন আমার বাড়িতে, আর শ্রীমান জিৎ বোস-কে একবার দেখে এবং দুটো কথা বলে বুঝে গেলাম যে মনের মতো রুকু পেয়ে গেছি।

এখানে বলি যে আমার অনেক ছবির জন্যেই ছোট ছেলে পাওয়া গেছে বেশ অদ্ভুতভাবে। পথের পাঁচালির অপুর জন্য ছেলে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অমুক দিন অমুক সময় পাঁচ থেকে সাত বছরের ছেলে সঙ্গে নিয়ে অভিভাবকরা যেন এসে দেখা করেন অমুক ঠিকানায়। বহু ছেলে এসেছিল। তার মধ্যে ছিল আবার একটি মেয়ে, যার বাপ-মা সবেমাত্র তাকে সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে (তখনও ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে!) ছেলের পোশাক পরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এদের কাউকেই পছন্দ হয়নি। শেষটায় ছেলে পাওয়া গেল আমাদের পাশের বাড়ি থেকে।

অপরাজিত ছবির জন্য দরকার ছিল আরেকটু বেশি বয়সের অপুর। কোথায় পাব জানি না ; অনেক ছেলে দেখেছি, পছন্দ হয়নি। শেষটায় একদিন সোনারপুরের দিকে একটা গ্রাম দেখে ট্রেনে করে ফিরছি, এমন সময় আমাদের কামরাতেই এসে উঠল একদল স্কুলের ছেলে। তারা এক্সকার্শন সেরে ফিরছে। একটি ছেলেকে দেখেই ভাল লাগল, কিন্তু এত ভিড়ে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। ট্রেন বালিগঞ্জে এসে থামল ; আমাদের সঙ্গে ছেলের দলও নামল। আমার পছন্দ-করা ছেলেটিকে একটা ট্রামে উঠতে দেখে দৌড়ে গিয়ে সেই ট্রামে উঠে ছেলেটির পাশে বসে তাকে সরাসরি জিগ্যেস করলাম সে সিনেমায় নামবে কিনা। সে বিনা দ্বিধায় ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে দিল। বললাম, 'তোমার বাবা-মা আপত্তি করবেন না সেটা কী করে জানলে?" তাতে ছেলেটি বলল যে তার বাবা নেই, আর মা যে আপত্তি করবেন না সেটা মাকে না জিগ্যেস করেও বলতে পারে। শেষ পর্যন্ত তার কথাই ঠিক বলে প্রমাণ হল। অথচ এই অপরাজিত ছবির জন্যই অপুর বান্ধবী লীলার উপযোগী কোনও মেয়ে না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত লীলার চরিত্রটাই ছবি থেকে বাদ

হয়ে যায়।

বেনারসে যখন রওনা হই তখন জয় বাবা ফেলুনাথ-এর জন্য সব লোক বাছা হয়ে গেছে। তাদের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর কাজ হবে বেনারসে, বাকি কাজ হবে কলকাতায় স্টুডিওতে মার্চ-এপ্রিল-মে-তে। সৌমিত্র ছাড়াও আরেকজন অভিনেতা চলেছেন আমাদের সঙ্গে। তিনি যে কাজটা করবেন সেটা অভিনয়ের চেয়ে কিছু কম কঠিন বা দায়িত্বপূর্ণ নয়। কাশীর ঘাটে গলিতে শুটিং দেখার জন্য ভিড় হবে সেটা আগে থেকেই জানি। এই ভিড় সামলাতে দুটি লোকের জুড়ি নেই। এক হল আমাদের ইউনিটেরই ভানু ঘোষ, যার এক হুঙ্কারে লোক ছিটকে পিছিয়ে পড়ে, আর দুই হল সোনার কেল্লার মন্দার বোস, অর্থাৎ অভিনেতা কামু মুখার্জি। এই কামুর সঙ্গে গুপী গাইন আর সোনার কেল্লাতে অনেকবার একসঙ্গে একই ট্রেনের বগিতে যাতায়াত করেছি। ভোরে কোনও স্টেশনে গাড়ি থামলেই কামুর হাঁক শোনা যায়— 'জাগো বাঙালি'। এই ডাকে অবিশ্যি দলের সকলেরই ঘুম ভেঙে যায়। আর তারপরে কামুরই উদ্যোগে ঘরে ঘরে চলে আসে চায়ের ভাঁড়। সোনার কেল্লার শুটিং-এ মারাত্মক কাঁকড়া বিছের ল্যাজের ডগায় হুলটাকে ঠিক বাঁচিয়ে খপ করে দু আঙুলে ল্যাজটা শূন্যে তুলে নিতে দেখেছি এই কামুকেই। সত্যি বলতে কি কামুর বিচিত্র কীর্তিকলাপের কথা লিখতে গেলে একটা পুরো বই হয়ে যায়। একটা উদাহরণ দিই।

গুপী গাইন শুটিং-এর জন্য যখন রাজস্থান যাই, তখন আমাদের দলে একজন অভিনেতা ছিলেন, তাঁর নাম রাজকুমার লাহিড়ি। তিনি রাজস্থানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জয়পুর থেকেই ছোট বড় মাঝারি নানান সাইজের নাগরা কিনতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বাড়িতে নাকি বিভিন্ন বয়সের অনেক মেম্বার, তারা সকলেই ফরমাশ দিয়েছে নাগরা নিয়ে যেতে। এই নাগরার বান্ডিলের আকার বাড়তে বাড়তে জয়সলমির পৌঁছে সেটা হয়ে গেল মোটামুটি একটা প্রমাণ সাইজ ধোপার পুঁটুলির মতো। লাহিড়ি মশাইয়ের এই বাতিক এবং এই বোঁচকা কারুরই দৃষ্টি এড়ায়নি।

জয়সলমিরে আমরা ছিলাম রাজার গেস্ট হাউস জওহরনিবাসে। তার দোতলায় আমার পাশের ঘরেই লাহিড়ি মশাইয়ের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। হলদে পাথরে তৈরি এই জওহরনিবাসকে একটা ছোটখাটো প্রাসাদ বলা চলে ; উঁচু সিলিং-ওয়ালা ঘরগুলো রীতিমতো বড়, এবং প্রত্যেক ঘরের জানালা দিয়ে হয় কেল্লা না হয় দিগন্ত-বিস্তৃত মরুপ্রান্তর দেখা যায়।

দিন দু'এক কাজ হবার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা— আমি যখন আমার ঘরে বসে পরদিনের কাজের প্ল্যান করছি— লাহিড়িমশাই আমার কাছে

এসে একটু ইতস্তত ভাব করে গলা খাঁক্‌রি দিয়ে বললেন, 'ইয়ে, আমার একটা, মানে, কমপ্লেন আছে'। কমপ্লেন খুব জরুরি না হলে আমার কানে পৌঁছয় না ; বুঝলাম ব্যাপারটা গুরুতর। বললাম, 'বলুন কী কমপ্লেন'। উত্তর এল, 'মানে, নাগরাগুলো পাচ্ছি না'। 'একটাও না ?' 'একটাও না। কেউ বোধ হয় ইয়ে করে নিয়েছে।'

'চুরি' কথাটা ভদ্রলোক যেন ব্যবহার করতে গিয়েও পারলেন না। 'ঠিক আছে, দেখছি কী করা যায়,' বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলাম, কিন্তু তাঁর আমসি-মুখে কোনও পরিবর্তন দেখলাম না।

এর পরে অনেককেই ডেকে নাগরার বিষয় জিগ্যেস করলাম, কিন্তু তারা কেউই এ ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করতে পারল না। শেষটায় এল কামু। আমার একটু সন্দেহ ছিল যে কামুই কালপ্রিট। তাকে জিগ্যেস করাতে সে চোখ কপালে তুলল— 'কে বলেছে নাগরা নিয়েছে ? নাগরা তো লাহিড়ি মশায়ের ঘরেই রয়েছে। আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।'

পাশের ঘরে যেতে কামু উপর দিকে আঙুল দেখাল। চেয়ে দেখি সুউচ্চ সিলিং-এর কড়িবরগায় বাঁধা দড়িতে ঝুলছে নাগরার ঝাড়লণ্ঠন— এত উঁচুতে যে সেটা চট্ করে চোখে পড়ার কথা নয়। এই নাগরাগুচ্ছের ঠিক নীচেই লাহিড়ি মশাইয়ের বিছানা। 'মেঝেতে অনেক জায়গা নিচ্ছিল বলে সিলিং-এ তুলে দিলুম', বলল কামু। তার পর পাশে দাঁড়ানো হতভম্ব লাহিড়ি মশাইয়ের দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বলল, 'আপনি এরকম চুকলিবাজ জানলে রাত্তিরে আপনাকে বিছানায় শুইয়ে ওই দড়ি কেটে দিতুম, তখন দেখতেন নাগরা Falls কাকে বলে !'

কামুর আরেকটা গুণের কথা এখানে বলতেই হয়। সেটা হল, কোনও কিছুর বর্ণনা দিতে অপ্রত্যাশিত উপমার ব্যবহার। একবার আমার বাড়িতে বসে বিস্কুট খেতে খেতে বলল, 'বউদি, এগুলোতে সাইলেন্সর লাগিয়েছেন বুঝি ?' অর্থাৎ বিস্কুট মিইয়ে যাওয়াতে চিবোলে শব্দ হচ্ছে না। জয়সলমিরে একদিন সকালে এসে কামু বলল সে সারারাত খড়কাটা মেশিনের শব্দে ঘুমোতে পারেনি। জয়সলমিরে খড়কাটা মেশিন কোথায় জিগ্যেস করাতে বলল তার ঘরে বৃদ্ধ গোবিন্দ চক্রবর্তী, যিনি গুপীর বাবা সেজেছিলেন, তিনি থাকেন, তাঁর নাকি রাত্রে কাশির ফিট ওঠে। যারা খড়কাটা মেশিনের শব্দ আর হেঁপো বুড়োর কাশির শব্দ দুটোই শুনেছে তারাই বুঝবে উপমাটা কী মোক্ষম।

কাশীতে পৌঁছে প্রথম দুদিন শুটিং-এর জায়গাগুলো আরেকবার ভাল করে দেখে নেওয়া হল। এটা ছাড়াও আরেকটা কাজ— সেটা হল, একটা ভাল বজরা ঠিক করা। এই বজরা ছবিতে হবে ভিলেন মগনলালের বজরা, আর যখন শুটিং হবে না, তখন এটিতে করে

মাল-পত্তর এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। একটা বেশ বড় বজরা ঠিক করে সেটাতে নতুন করে রং দিয়ে নকশা করার জন্য কারিগর লাগিয়ে দেওয়া হল। দরজার দুদিকে থাকবে সশস্ত্র সেপাইয়ের ছবি, আর জানালার চারপাশে থাকবে ফুল-পাতার নকশা। বেনারসে অনেক বাড়ির গায়ে এরকম দেখা যায়— হাতি, ঘোড়া, ময়ুর, টিয়া, বাঘ, রাজা, সেপাই। এই নকশার উপলক্ষ হচ্ছে বিয়ে। বিশ বছর আগে দেখেছি এই সব নকশার তুলির টান একেবারে পাকা শিল্পীর হাতের টানের মতো। আজকাল আঁকার ভাল লোক পেতে অনেক খুঁজতে হয়।

শুটিং শুরুর দিন, অর্থাৎ তেরই ফেব্রুয়ারি, ভোর সাড়ে ছটায় দ্বারভাঙা ঘাটে পৌঁছে সাড়ে দশটার মধ্যে মছলিবাবার আস্তানা আবিষ্কারের পুরো দৃশ্যটা শেষ হয়ে গেল। যারা ফিল্ম তৈরি করে, তাদের একটা হিসেব আছে যে দিনে যদি তিন মিনিটের ছবি তোলা যায় তা হলে বুঝতে হবে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। তিন মিনিটের ছবি মানে পর্দায় দেখাতে যেটা তিন মিনিট সময় নেবে। এই হিসেবেই যে ছবি পর্দায় চলবে ২ ঘণ্টা অথবা ১২০ মিনিট, সে ছবি তুলতে গড়ে লাগে ৪০/৪৫ দিন। স্টুডিওর আট ঘণ্টা কাজের মধ্যে তিন মিনিটের ছবি তোলা কঠিন নয়। কিন্তু আউটডোরে মাত্র এক সকালে আজ আমরা প্রায় রেকর্ড করে ফেলেছি, কারণ আজকের এই দৃশ্য পর্দায় থাকবে প্রায় পাঁচ মিনিট।

প্রথম দিন বলে ঘাটে শুটিং দেখার জন্য বেশি ভিড় হয়নি। যারা এগিয়ে এসে দেখার বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, তাদের দিয়ে ঘাটে হাঁটা-চলা করিয়ে শটেই কাজে লাগিয়ে নেওয়া গেল। সব রকম লোকই ঘাটে হাঁটা চলা করে, কিন্তু ছবিতে দেখাতে গেলে এমন লোক চাই যাদের কাশীর ঘাটে মানায় ভাল। এই সব লোকের জন্য দৃষ্টি সজাগ রাখতে হয়। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, পাণ্ডা বা তীর্থযাত্রী টাইপের লোক, বা লাঠি হাতে কোমর ভাঙা বুড়ি— এদের দেখলেই আমাদের লোভ লেগে যায় তাদের কথা বলে বুঝিয়ে ছবির কাজে লাগানোর জন্য। শুধু মানুষ নয়, গরু ছাগল কুকুর এসবও এই ভাবে কাজে লাগিয়ে নিতে হয়। ইচ্ছে করলে পুলিশ লাগিয়ে ঘাটকে-ঘাট খালি করে দিয়ে শুধু অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করা যায়, কিন্তু বেনারসের ঘাটে একমাত্র ফেলুদাই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এ দৃশ্য একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য হত না। তাই লোক জোগাড়ের জন্য এত মেহনত।

এখানে বলে রাখি যে প্রথমবার দ্বারভাঙা প্যালেসে ঢুকে উঠোনের ডানদিকে যে স্তূপীকৃত পুরনো ভাঙা আসবাব দেখেছিলাম, আজ তার সমস্তটুকু দড়ি দিয়ে বেঁধে একতলা থেকে দোতলায় চালান করে দিতে

হয়েছিল। সেগুলো রাখা হয়েছিল দোতলার বারান্দার একটা কোণে। আচমকা মছলিবাবা এসে পড়ায় এই ভাঙা আসবাবের স্তূপের পিছনেই হয়েছিল ফেলুদার লুকোনোর জায়গা।

সকালের কাজ শেষ করে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই যে যার হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেলের প্রোগ্রাম হল চারটের মধ্যে আবার ঘাটে হাজির হওয়া। মগনলালের বজরা করে মছলিবাবা দর্শনে আসছেন সেই দৃশ্য তোলা হবে।

প্রথম দিন সকালে দ্বারভাঙা ঘাটের শুটিং-এ বিশেষ ভিড় না হলেও, বিকেলে সেই একই ঘাটে গিয়ে দেখি তার চেহারাটা হয়েছে ফুটবল স্টেডিয়ামের মতো। শুধু ঘাটে কেন, গঙ্গার বুকেও হঠাৎ নৌকার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যারা ডাঙায় জায়গা পায়নি তারা জল থেকে শুটিং দেখার মতলব করেছে। নৌকোয় আপত্তি নেই, কারণ বেনারসে ছুটিতে এসে বহুলোকেই বিকেলে নৌকো ভাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু ঘাটের দর্শকদের সামলাতে হবে। এই ভিড় জিনিসটা যে কী মারাত্মক হতে পারে সেটার একটা উদাহরণ আমারই একটা পুরনো ছবি থেকে দিই।

চিড়িয়াখানা ছবির শুটিং হয়েছিল কলকাতার বাইরে বারাসত ছাড়িয়ে বামুনগাছি বলে একটা গ্রামে। আমবাগানের মধ্যে একটা বেশ বড় খোলা জায়গায় আমরা পাঁচিলে ঘেরা গোলাপ কলোনির সেট তৈরি করে নিয়েছিলাম। কোনও ফিল্মের জন্য তৈরি করা ঘরবাড়ি রাস্তাঘাটকে বলে সেট। গল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ সাহেবের বিশেষ করে তৈরি এই কলোনিতে ছিল ফুলের বাগান (যাকে বলে নার্সারি), পুকুর, কলোনির কর্মচারীদের থাকবার জন্য গোটা ছ'য়েক কটেজ, জজ সাহেবের নিজের বাংলো, একটা বড় গোয়ালে আট-দশটা গরু, আর বেড়া দিয়ে ঘেরা পোল্‌ট্রি। অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশ। প্রায় এক মাস ধরে অনেক খেটে অনেক খরচে আমরা তৈরি করেছিলাম এই কলোনি। শুটিং-ও হবে প্রায় একমাস।

শুটিং-এর জায়গা থেকে মাইল দু-এক দূরে রেলের স্টেশনে ট্রেন আসা-যাওয়ার শব্দ পেতাম। এটা জানতাম যে দুপুরে একটার সময় কলকাতার একটা ট্রেন এসে সেখানে থামে।

প্রথম কয়েকদিন নির্বিবাদে কাজ হল। তার পর একদিন কলকাতার ট্রেনটা ছেড়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে একটা কোলাহল শুনতে পেলাম। ক্রমে কোলাহল স্পষ্ট হবার পর বুঝতে পারলাম ছেলের দল আসছে স্লোগান দিতে দিতে। স্লোগান হল, 'শুটিং দেখতে দিতে হবে। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!' আরও কাছে এলে পর পাঁচিলের উপর দিয়ে

সড়কির ডগা দেখা গেল। পরে বেরোল সেগুলো সড়কি নয়, ছেলের দল আখের খেত থেকে খান পঞ্চাশেক আখ উপড়ে নিয়ে সেগুলো কাঁধে নিয়ে আসছে। তারা এসেই পাঁচিলের বাইরে যত আমগাছ ছিল সব কটার জুতসই ডালগুলো দখল করে ফেলল। অবাক হয়ে দেখলাম যে ছেলের ভিড়ে গাছের পাতা আর দেখাই যাচ্ছে না। আমরা এই অবস্থাতেই কাজ শুরু করে দিলাম, কারণ একবার তাদের নামতে বলার পরক্ষণেই কলোনি জুড়ে ইষ্টকবর্ষণ শুরু হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক কাজের পর হঠাৎ একটা মড় মড় শব্দ শোনা গেল, এবং তার পরেই ঝুপঝাপ, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ!

একটা গাছের ডাল ভেঙে সাতটি ছেলে মাটিতে পড়েছে, তার মধ্যে একজন গুরুতর ভাবে জখম। সেই জখম ছেলেকে ফার্স্ট এড দিল আমাদেরই একজন অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শুভেন্দু এককালে ডাক্তারির ছাত্র ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে এমন একটা দুর্যোগের পরেও দলের কারুরই শুটিং দেখার উৎসাহ কমল না, এবং একটি ছেলেও গাছ থেকে নামল না। এই ভাবে এই অবস্থায় পর পর চারদিন আমাদের শুটিং করতে হয়েছিল। এমনও দেখেছি যে মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাদের কাঁধে চড়িয়ে গাছে তুলে দিচ্ছে এই সব ছেলেরা। মহিলারাও এই সুবর্ণসুযোগ পেয়ে পরম আহ্লাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের ডালে বসে কাটিয়ে দিচ্ছেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, সিনেমাটা যে পর্দায় দেখার জিনিস সেটা অনেকেই ভুলে যায়। তারা ভাবে খোলা মাঠে যেমন লোকে যাত্রা দেখে, খোলা রাস্তাঘাটে শুটিং দেখাটাও বুঝি সেই রকম জিনিস।

যাই হোক, ঘাটে ভিড় হবে সেটা আন্দাজ করেছিলাম, তাই সঙ্গে মোটা দড়ি আনা হয়েছিল। সেটা বার করে ভানু আর কামু কর্ডন তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এসব অবস্থায় মেজাজ গরম করে লাভ হয় না; সবাইকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দিতে হয় ভিড় করে এগিয়ে এলে আমাদের কাজের কী ধরনের ক্ষতি হয়। যখন বলা হল যে কাজের জায়গাটুকু খালি করে না দিলে আমরা কাজ বন্ধ করে ক্যামেরা গুটিয়ে সরে পড়ব, আর তা হলে কারুরই কিছু দেখার থাকবে না, তখন সকলেই মোটামুটি ভদ্র হয়ে দড়ির পিছনে রয়ে গেল।

এদিকে উৎপল দত্ত উত্তরে দুটো ঘাট দূরে বজরার মাথায় আরামকেদারায় রেডি হয়ে বসে আছে, আমাদের একজন লোক সে ঘাটে রাখা হয়েছে, আমরা তৈরি হলে তাকে সিগন্যাল করব, তখন তার

ইশারায় মগনলালের বজরা আমাদের ঘাটের দিকে রওনা হবে। দ্বারভাঙা ঘাটে ফেলুদা, লালমোহন আর তোপসে রেডি হয়ে আছে আর তাদের সঙ্গে আছেন লিট্‌ল থিয়েটারের সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ক্যালকাটা লজের ম্যানেজার চক্রবর্তী মশাইয়ের পার্ট করেছেন। মগনলালের বজরা দেখতে পেয়ে এই চক্রবর্তী মশাই কাশীর এই ডাকসাইটে লোকটিকে ফেলুদের চিনিয়ে দেবেন। ফেলু বাইনোকুলার দিয়ে মগনলালকে দেখবে, তার পর বজরা আমাদের ঘাটে লাগলে পর মগনলাল ছাত থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ভৃত্যের হাত থেকে রুপোর রেকাবির উপর সিল্কের রুমাল দিয়ে ঢাকা উপঢৌকন নিজের হাতে নিয়ে ফেলুদের সামনে দিয়েই মছলিবাবার সভার দিকে চলে যাবে। লাল হল মছলিবাবার নম্বর ওয়ান ভক্ত।

যদিও মছলিবাবা ঘাটেরই একটা অংশে বসেন, এ দৃশ্য কাশীতে না তুলে কলকাতায় তোলা হবে, কারণ সভায় অনেক ঘটনা আছে, সেটা স্টুডিওতে তোলা অনেক বেশি সুবিধা। এবারে, ফেব্রুয়ারি মাসে, তোলা হল মগনলাল ফেলুদার সামনে দিয়ে মছলিবাবার দিকে এগিয়ে গেলেন। আর এপ্রিল মাসে কলকাতায় তোলা হবে মগনলাল মছলিবাবার সামনে বসে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাতে উপঢৌকন তুলে দিলেন। দর্শক যখন দেখবে, তখন এই দুমাসের ব্যবধান তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

প্রথম দিন মগনলালের যে দৃশ্যটা তোলা হল সেটা ছবির একেবারে গোড়ার দিকের দৃশ্য, আর দ্বিতীয় দিন তোলা হল ছবির একেবারে শেষ দিনের দৃশ্য। এখানেও মগনলাল বজরা করে এসে হাতে ভেট নিয়ে সিঁড়ি উঠছে। কিন্তু এবার তাকে দেখছে কেবল লালমোহন আর তোপসে। এই লালমোহন আর তোপসেকে দেখে চেনা মুশকিল হবে, কারণ তারা দুজনেই ফেলুর নির্দেশমতো ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে। দুজনেরই পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, কপালে চন্দন আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লালমোহনের হাতে আবার যষ্টি আর কমণ্ডুল। তাকে বুরুজের উপর বসে মাঝে মাঝে গালবাদ্য আর ববম্‌ ববম্‌ করতে হচ্ছে, তোপ্‌সে খেয়াল রাখছে জটায়ু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে কিনা। মেক-আপ যে দুর্ধর্ষ রকম ভাল হয়েছিল সেটা বুঝলাম যখন দেখলাম লালমোহন ঘাটে হাজির হওয়ামাত্র একটি পাণ্ডা তাকে মহাভক্তিভরে প্রণাম করল। লালমোহনও দেখি দিব্যি আধবোজা চোখে তার মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

ভিড় সত্ত্বেও ঘাটের শুটিং আশ্চর্যভাবে উতরে গেল। কাজের শেষে আমরা আর ভিড়ের দিকে না গিয়ে সবাই মিলে বজরার ছাতে চড়ে বসলাম। বজরাই আমাদের দশাশ্বমেধ পৌঁছে দিল। যেদিন সকাল থেকে বিকেল অবধি ঘাটে কাজ হত সেদিন দুপুরের খাওয়াটা বজরাতে

বসেই সারা হত। কাগজের বাক্সে শুক্‌নো খাবার, শেষ হলেই বাক্স জানালা দিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আর অমনি চিলের দল ছোঁ মেরে বাক্স থেকে চপ-কাটলেটের টুকরো তুলে নিচ্ছে।

দ্বারভাঙার কাজ শেষ করে আমাদের যেতে হয়েছিল দক্ষিণে বেশ খানিকটা দূরে বিখ্যাত কেদার ঘাটে। কাউকে বলা হয়নি যে আমরা ঘাট বদল করছি, তাই বিকেল হতে না হতে সব লোক গিয়ে হাজির হয়েছিল সেই দ্বারভাঙা ঘাটেই। কিন্তু কেদার ঘাটে শুটিং-এর তোড়জোড় করার সময় দেখা গেল উত্তর দিক থেকে পিল পিল করে লোক আসছে হেঁটে আর নৌকায় এই কেদারের দিকেই। আসল খবর কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে শুটিং দর্শনপ্রার্থীদের কানে সেটা দেখে বেশ অবাক লাগল। ভিড় যদি বা দূরে সরে গিয়ে আমাদের শট্‌ নিতে দেয়, তা হলেও একটা অসুবিধায় পড়তে হয় তখনই যদি দৃশ্যটা হয় মজার, আর সেই মজায় যদি লালমোহনের একটা বড় ভূমিকা থাকে। শটের মধ্যে দর্শক হো হো করে হাসতে আরম্ভ করে, ফলে অভিনেতারা যে কী কথা বলছে, আর সেটা ঠিক ভাবে বলছে কিনা বোঝা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। টেপ রেকর্ডারে অবিশ্যি সাউন্ড তোলা হচ্ছে, কিন্তু তাতেও দর্শকদের হাসির শব্দ অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে। এই হাসির ভেতর ফেলু তোপসে লালমোহনের কথা খুঁজে বার করা অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ এ কাজটা না করলেও নয়, কারণ কলকাতায় এসে এই টেপ শুনেই এদের তিনজনকে দিয়ে আবার কথাগুলো বলিয়ে নতুন করে রেকর্ড করে ছবির সঙ্গে জুড়তে হবে। একেই বলে 'ডাবিং'। এই ডাবিং নিখুঁত হলে পরে ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে কথা হুবহু মিলে যায়, আর লোকে ধরতেই পারে না যে ছবি আগে তোলা হয়েছে, শব্দ পরে জোড়া হয়েছে।

ঘাটের পরে গলি নিয়ে পড়তে হল। ফেলুদারা এসে উঠেছে দশাশ্বমেধ রোডের উপর ক্যালকাটা লজ হোটেলে। সেখান থেকে বিশ্বনাথের গলি ধরে জ্ঞানবাপী পেরিয়ে আরও কয়েকটা অলিগলি পেরিয়ে তাদের যেতে হবে মগনলালের বাড়ি। এই যাওয়ার পথে কথাবার্তা আছে, আর আছে ষাঁড়ের সামনে পড়ে লালমোহনের ভড়কানো। বিশ্বনাথের গলিতে ভিড় ম্যানেজ করে শট্‌ নিয়ে জ্ঞানবাপীতে মগনলালের সঙ্গে মিটিং-এর শট্‌ নিয়ে যে গলিতে ষাঁড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সেখানে ক্যামেরা সমেত গিয়ে হাজির হলাম। কলকাতায় বসে যখন চিত্রনাট্য লিখেছি তখন জানতাম না যে কাশীতে গত কয়েক বছরে ষাঁড়ের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। অথচ ষাঁড় ছাড়া কাশী ভাবাই যায় না, আর ষাঁড়ের সামনে পড়ে জটায়ুর কী দশা হবে

সেটাও দেখানো দরকার। গলির লোকেরা বলল, কাছাকাছির মধ্যে কোনও ষাঁড় নেই, ষাঁড় আনতে হবে ঘাট থেকে। তার মানে কম করে মাইল খানেকের পথ। আর ষাঁড়বাবাজি সেখানে থাকলেও, তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র ছেড়ে আমাদের বাছাই করা এই গলিতে আসবেন কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন।

কামু এগিয়ে হল। বলল হাতে ষাঁড়ের খাদ্য কিছু শাকসবজি নিয়ে ষাঁড়কে প্রলোভন দেখিয়ে সে যে করে হোক তাকে শুটিং-এর জায়গায় এনে হাজির করবে। কামু আমাদের সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে চলে গেল, আমরা অপেক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম। খুব ভোরে বেরোনো হয়েছে, প্রাতরাশের সময় পাওয়া যায়নি, তাই কাছেই বিশাল আকারের জিলিপি ভাজা হচ্ছে দেখে তাই দিয়ে সকলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম।

লালমোহন দেখলাম মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন; সেটা বোধহয় ষাঁড়ের চিন্তাতেই। সোনার কেল্লায় তাঁকে উটের সামনে পড়তে হয়েছিল; সেখানেও চিন্তার কারণ ছিল। তবে ষাঁড়ের তুলনায় উট অনেক বেশি নিরীহ। ষাঁড়মশাই কখন কী করে বসেন সেটা আগে থেকে অনেক সময়ই বোঝা যায় না। তাই লালমোহনের উদ্বেগের কারণ আছে বইকি। এখানে আরেকটা দৃশ্য নিয়ে একজন অভিনেতার উদ্বেগের গল্প একটু বলে রাখি। সোনার কেল্লার ভিলেন মন্দার বোস ডাক্তার হাজরাকে ঠেলা মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল। শৈলেন মুখার্জি করেছিল ডাক্তার হাজরার পার্ট। তাকে যে মন্দার বোস ঠেলা মারবে সেটা শৈলেন জানত, কিন্তু দৃশ্যটা ঠিক কিভাবে তোলা হবে সেটা আমার জানা থাকতেও আমি ওকে বলিনি। ও বোধ হয় ভেবে রেখেছিল যে সত্যজিৎ রায় যখন ফাঁকি দেওয়া পছন্দ করেন না তখন ওকে বুঝি সত্যিই পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে। রাজস্থান যাবার আগে শৈলেন তার বাড়িতে বলে গেল— 'যাচ্ছি তো, কিন্তু হাড়গোড় কিছু রেখে আসতে হতে পারে এটা বলে গেলাম'। তার পর একেবারে জয়পুর পৌঁছে শট্ দেবার ঠিক আগে শৈলেনকে বলা হয় যে তাকে মন্দার বোস ঠেলা মারবে ঠিকই, কিন্তু সে পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ার আগে তাকে ধরে নেবে, আর তার পর তাকে দেখানো হবে একেবারে পাহাড়ের নীচে জখম অবস্থায় পড়ে আছে। সুতরাং তার চিন্তার কারণ নেই। শট্ নেবার পর সেই দিনই শৈলেন কলকাতায় টেলিফোন করে জানিয়ে দিল— 'তোমাদের কোনও চিন্তা নেই, আমার হাড়গোড় সব ঠিকই আছে'।

এদিকে ষাঁড়ের গলিতে ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে। ঘাটে ছিল বাঙালিদের ভিড়, আর এখানে শুনছি খালি হিন্দি কথা। শুটিং দেখার উৎসাহে এখানেও কেউ কম যায় না। মনে মনে ভাবছি ষাঁড় কাছাকাছি

পৌঁছলেও এই ভিড় ভেদ করে আমাদের ক্যামেরার সামনে পৌঁছবে কি?

প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কামুর আবির্ভাব হল। কিন্তু ষাঁড় কই? কামু মুখ কালো করে বলল ষাঁড় অর্ধেক পথ খাদ্যের লোভে তার পিছন পিছন এসে হঠাৎ কী খেয়ালে মাইন্ড চেঞ্জ করে উল্টোমুখো ঘুরে তার জায়গায় ফিরে গেছে। তবে কি ষণ্ডপর্ব বাদ দিতে হবে? সে হয় না। কাশীতে এসে ষাঁড় পাওয়া যাচ্ছে না বলে ঘটনা পাল্টাবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই।

এই সময় গলির মাথা থেকে হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা গেল। আমাদের যে একটা ষাঁড়ের দরকার সে খবরটা ইতিমধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দু-একজনকে বলেও দেওয়া হয়েছিল কাছাকাছি সন্ধান করতে। তাদেরই একজন একটা জাঁদরেল ষাঁড় দেখতে পেয়ে সেটাকে ধরে এনেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ষাঁড়ের মালিককেও ধরে এনেছেন। কিন্তু ক্যামেরা যেখানে দাঁড় করানো হয়েছে— অর্থাৎ দৃশ্যটা যেখানে নেব বলে ঠিক করেছি— সেখানে ষাঁড়টাকে আনা যাবে না, কারণ ষাঁড় আর ক্যামেরার মধ্যিখানে গলির মুখটাতে একটা লোহার বেড়া রয়েছে, সেটার মধ্যে দিয়ে একটা মাঝারি সাইজের গরু ঢুকবে, কিন্তু ষাঁড় ঢুকবে না। গলির উল্টোমুখে বেড়া নেই, কিন্তু সেখান দিয়ে ষাঁড় আনতে হলে আরও চারটে গলি ঘুরে উলটো দিক দিয়ে আনতে হবে। তাও আবার মাঝপথে যে ষাঁড় বেঁকে বসবে না, তার কী ঠিক? তাই আমার ক্যামেরাটাকেই নিয়ে গেলাম বেড়ার ওপারে। দৃশ্যটা হচ্ছে এই— মগনলালের লোক ফেলুদা আর তোপসকে নিয়ে ষাঁড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে, ফেলুদা কয়েক পা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখবে লালমোহন ষাঁড়ের সামনে পড়ে থমকে গেছে। কারণ জিগ্যেস করাতে লালমোহন জানাবে যে আটান্তরে তার নাকি একটা ফাঁড়া আছে, এবং তার বিশ্বাস যে এই ষাঁড়ই সেই ফাঁড়া। ফেলু এগিয়ে গিয়ে তাকে ধমক দেওয়াতে কোনও রকমে সাহস সঞ্চয় করে বাধা অতিক্রম করে লালমোহন হাঁপ ছাড়বে।

আমরা নতুন জায়গায় ক্যামেরা বসিয়ে একটা রিহার্সাল করব বলে তোড়জোড় করছি, এমন সময় লক্ষ করলাম যে জনতার মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। কাশীর লোকেরা ষাঁড় জিনিসটাকে বেজায় ভক্তি করে। সেই ষাঁড়কে এতক্ষণ গলির মধ্যে আটকে রাখাতে তাদের মধ্যে থেকে আপত্তি উঠেছে। বুঝলাম রিহার্সাল-টিয়ার্সাল চলবে না। দুর্গা বলে কপালে যা থাকে করে শট্টা নিয়ে নিতে হবে। মগনলালের নীল-সার্ট পরা লোক আর থ্রি মাসকেটিয়ার্স ষাঁড়ের পিছনে

গিয়ে দাঁড়াল।

ক্যামেরা রেডি করে 'অ্যাকশন' বলতে তারা এগিয়ে এল সামনের দিকে। নীল সার্ট কাশীরই লোক, এই শ্রেণীর জানোয়ারে অভ্যস্ত, সে ষাঁড়টার পাশ দিয়ে যাবার সময় সেটাকে মৃদু ধাক্কা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ফেলু আর তোপসের জন্য পথটা একটু চওড়া করে দিল, ফেলু আর তোপসে দিব্যি বেরিয়ে গেল। লালমোহনের কথা ছিল ষাঁড়টাকে দেখে হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়বেন, আর কথামতো দাঁড়ালেনও বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে ষাঁড়বাবাজি হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে এমন ভাবে শিংনাড়া দিয়ে উঠলেন যে ভয়টা আর লালমোহনের অভিনয় করে দেখাতে হল না। ষাঁড়ের আস্ফালনে জটায়ু চোখ কপালে তুলে হাত পা ছুঁড়ে ছিটকে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। ফলে দৃশ্যটা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে তিনগুণ বেশি ভাল হয়ে গেল। দুঃখের বিষয় ক্যামেরা ঠিকমতন কাজ না করায় এমন চমৎকার ষাঁড়ের শট্‌টা শেষ পর্যন্ত ছবি থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল।

ছবিতে দেখতে যে জিনিসটা খুব সহজসাধ্য বলে মনে হয়, শুটিং করতে অনেক সময় সেটার জন্য অনেক মেহনত করতে হয়। প্রত্যেক ছবিতেই এ ধরনের সহজ-কিন্তু-সহজ-নয় শট্ বা দৃশ্য থাকে ; তার কয়েকটার কথা শুটিং-এর গল্প করতে গিয়ে তোমাদের আগেও বলেছি। জয়-বাবা ফেলুনাথেও ছিল। তার একটার কথা বলি।

ফেলুদা, লালমোহন আর তোপ্‌সেকে ছবিতে প্রথম দেখা যাবে তারা মালপত্র নিয়ে সাইকেল রিক্সায় চেপে বেনারসের রাস্তা দিয়ে তাদের হোটেল ক্যালকাটা লজের উদ্দেশে চলেছে। একটা রিকশায় ফেলু, আরেকটায় লালমোহন আর তোপসে। দূর থেকে যদি এদের দেখানো হয় তা হলে কোনও সমস্যা নেই ; কিন্তু প্রথম দর্শনের পক্ষে সেটা ভাল নয়, কারণ তাতে লোকের মন ভরবে না, আর মানুষগুলোকে চেনানোও মুশকিল। তাই তাদের চলন্ত রিকশার কাছ থেকেই দেখাতে হবে। এইভাবে ক্লোজ-আপে দেখালে লালমোহনের কিছু বিশেষ অভিব্যক্তি ক্যামেরায় ধরা পড়বে। তীর্থস্থানে পা পড়তেই লালমোহনের ভক্তিভাব জেগে উঠেছে, তাই রাস্তার ধারে মন্দির দেখলেই সে কপালে হাত ঠেকাচ্ছে।

মুশকিল হল এই যে চলন্ত রিকশার সামনে থেকে যাত্রীর ক্লোজ-আপ নিতে গেলে ক্যামেরা রাখতে হয় চালকের জায়গায়। তাই যদি হয় তা হলে রিকশা চলবে কী করে ?

অনেক মাথা ঘামিয়ে ঠিক করা হয় যে সামনের চাকা সমেত চালকের সিটটা খুলে রিকশার পিছনের অংশটা জুড়ে দেওয়া হবে একটা ট্যাক্সির

পিছনে। ক্যামেরাম্যান সমেত ক্যামেরা থাকবে ট্যাক্সির পিছনের ক্যারিয়ারে, আর ট্যাক্সিটা রিকশাকে টেনে নিয়ে চলবে ঠিক রিকশারই স্পিডে।

একটা রিক্সাওয়ালাকে বলাতে সে তার গাড়িতে এই সার্জিক্যাল অপারেশনটা করতে রাজি হয়ে গেল। চালকের অংশ খুলে ফেলা হল, আর বাকি অংশটা আমাদের কাজের জন্য বহাল করা তিনটে ট্যাক্সির একটার পিছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। তার পর ক্যারিয়ারের ঢাকনা খুলে ফেলে ক্যামেরা বসিয়ে সেটাকেও দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। কিন্তু রিকশায় লালমোহন আর তোপ্‌সেকে বসিয়ে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দেখা গেল তারা দুজন বড্ড বেশি কাছে এসে পড়েছে। যাত্রীদের যখন আর পিছনো যাবে না, তখন ক্যামেরাকেই পিছোতে হবে। শেষটায় গাড়ির পিছনের কাচ খুলে ফেলে ক্যামেরা হাতে নিয়ে পিছনের সিটে উল্টো দিকে মুখ করে চোখ লাগিয়ে দেখা গেল এবারে ঠিক যেমনটি চাই তেমনটি হয়েছে।

তোড়জোড়টা করা হচ্ছিল রাস্তার উপর, ফলে যথারীতি চারিদিকে ভিড় জমে গেছে। শট্ নেব বলে যখন ট্যাক্সি রওনা করে দেওয়া হয়েছে তখন দেখি বেশ কিছু বেনারসি মস্তান সাইকেল চেপে ঠিক তোপসে আর লালমোহনের গা ঘেঁষে চলেছে, যাতে ক্যামেরায় তাদের ছবি উঠে যায়। এবার আর মিষ্টি কথায় কাজ হবে না, তাই দলের ছেলেরা কোমর বেঁধে লেগে গেল এই ক্যামেরা-লোলুপদের তাড়ানোর জন্য। মাইলখানেক চলার পর যখন দেখা গেল রোড ক্লিয়ার, সাধারণ পথচারী আর যানবাহন ছাড়া আর কিছু নেই, তখন ট্যাক্সি থেকে হাঁক দিয়ে লালমোহন আর তোপ্‌সেকে জানানো হল যে শট্ নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে সেই রিকশাতে বসিয়ে ফেলুর শট্‌টাও নেওয়া হল। এই কারসাজিটা জানা না থাকলে পর্দায় দেখে কেউ বুঝতে পারবে না কী করে এই শট্ নেওয়া হয়েছে।

বেনারসে একটা ছাড়া সব দৃশ্যই নেওয়া হয়েছিল দিনের বেলায়। দিনের শুটিং এর ঝামেলা রাত্রের তুলনায় অনেক কম। তার একটা কারণ এই যে ছবি তুলতে গেলে—বিশেষ করে বেনারসের গলি-টলিতে—নিজেদের আলোর ব্যবস্থা করতে হয়। স্টুডিওতে যেমন লোহার স্ট্যান্ডে লাগানো বড় বড় আলো ব্যবহার করতে হয়, তেমন সব আলো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়, আর তাতে লটবহর বেড়ে যায় অনেক বেশি। তা ছাড়া যেখানে শুটিং হবে সেখানে ইলেকট্রিক কানেকশনের ব্যবস্থা করতে হয়, যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই সেখানে জেনারেটর নিয়ে যেতে হয়, ফলে যে অঞ্চলে শুটিং হবে সেখানকার লোকদের বেশ ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হয়। বেনারসে আমাদের নাইট-শুটিং হয়েছিল

বাঙালিটোলার পাশে হাভেলি বা পাঁড়ে হাউলিতে। তবে সেটার কথা বলার আগে রাজস্থানে সোনার কেল্লার একটা নাইট শুটিং-এর কথা এই ফাঁকে বলে নিই।

গল্পে ঘটনাটা ঘটছে মাঝরাত্তিরে, আর আমাদের শুটিংটাও হয়েছিল মাঝরাত্তিরে একেবারে হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে। ফেলুদা, তোপ্‌সে আর লালমোহন রামদেওরা স্টেশন থেকে জয়সলমিরের ট্রেনে উঠেছে। কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর তাদেরই কামরার পাদানিতে এসে উঠেছে রাজস্থানির ছদ্মবেশে মন্দার বোস। ট্রেনের কামরার ভিতরে যা কিছু ঘটনা ঘটবে সে সব তোলা হবে কলকাতার স্টুডিওতে আমাদের তৈরি কামরাতে। কিন্তু কামরার বাইরে বেশ কিছু শট আছে যেটা স্টুডিওতে নেওয়া সম্ভব নয় তার মধ্যে সব দিক দিয়ে সবচেয়ে কঠিন শট্ হল মন্দার বোস চলন্ত ট্রেনে লোহার রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে এক কামরা থেকে আর এক কামরায় চলে যাচ্ছে। কাজটা সবচেয়ে কঠিন অবিশ্যি কামু মুখার্জির জন্য, যিনি মন্দার বোসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এ দৃশ্য বিদেশে তোলা হলে অভিনেতার বদলে পেশাদারি স্টান্টম্যান ব্যবহার করা হত। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে ভাল স্টান্টম্যান নেই। সেটা আমরা জেনেছিলাম জলসাঘর ছবি তোলার সময়। ছবির শেষ দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল জমিদার বিশ্বম্ভর রায় ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছেন। ছবি বিশ্বাসকে দিয়ে তো আর এ কাজ করানো যায় না, কাজেই খাঁ সাহেব বলে কলকাতার অন্যতম সেরা স্টান্টম্যানকে নেওয়া হয়েছিল। এই খাঁ সাহেবকে বালির উপর একটিবার মাত্র ঘোড়া থেকে পড়ে তিন দিন শয্যা নিতে হয়েছিল। সোনার কেল্লার এই দৃশ্যের জন্য অবিশ্যি কামু গোড়া থেকেই বলে রেখেছিল যে এই অসমসাহসিক কাজটা ও নিজেই করবে। কামুর ডানপিটেমোর নমুনা আমরা আগেও পেয়েছি, তাই তার কথায় ভরসা না করার কোনও কারণ দেখিনি।

দৃশ্যটা তোলার জন্য জয়সলমিরের পথে 'লাঠি' বলে একটা ছোট্ট স্টেশন বাছা হয়েছিল। এঞ্জিন ও কামরা সমেত স্পেশাল ট্রেন এসেছে শুটিং-এর জন্য। ড্রাইভারমশাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে হয়তো আমাদের নির্দেশমতো বার বার ট্রেন আগুপিছু করতে হতে পারে।

ট্রেন ছাড়াও আর একটা জিনিস এসেছে আমাদের কাজের জন্য, সেটা হল একটা ট্রেনের ট্রলি। লাইনের উপর দিয়ে মানুষে ঠেলে নিয়ে যাওয়া এই ট্রলি নিশ্চয় তোমরা সকলেই দেখেছ। ট্রেন যে লাইনে চলবে তার ঠিক পাশেই সমান্তরাল লাইনে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চলবে ট্রলি, আর সেই ট্রলির উপর থাকবে আমাদের ক্যামেরা। সঙ্গে আর একটা ক্যামেরা আছে, সেটা থাকবে সহকারী ক্যামেরাম্যান পূর্ণেন্দুর হাতে। তাকে চড়তে

হবে কামরার ছাতে। ছাতে উপুড় হয়ে শুয়ে ক্যামেরাটাকে হাতে নিয়ে সেটা ঝুলিয়ে দিতে হবে এমন ভাবে যাতে ঠিক মন্দার বোসের মাথার উপর থেকে দৃশ্যটা তোলা যায়। এই ভাবে মন্দার বোসের সার্কাসের খেল আরও শ্বাসরোধকারী বলে মনে হবে।

তোড়জোড় যখন শেষ হল তখন রাত বারোটা। প্রায় মরুভূমির মাঝখানে রেলের স্টেশন। কামু তৈরি হয়ে কামরার পাদানিতে উঠে দরজার লোহার রডটা ধরতেই বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ার মতো করে হাতটা পিছিয়ে নিল। লোহা এমনই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে হাতে ধরা যায় না। এই ঠাণ্ডা সইয়ে নিতে মিনিটখানেক সময় নিল। তার পর আমরা সবাই তৈরি হয়ে এঞ্জিনের দিকে টর্চ ফেলে জানিয়ে দেওয়া হল যে এবার গাড়ি ছাড়তে হবে। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলের কুলি আমাদের ট্রলি ঠেলতে আরম্ভ করল। গাড়ি একটু স্পিড নিলে তবে শট্ দেওয়া হবে। আমি আর সৌমেন্দু ট্রলির ক্যামেরার সঙ্গে রয়েছি, পূর্ণেন্দু কামরার ছাত থেকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে রেডি, আর ট্রলির কুলিও আশ্চর্যভাবে ঠিক ট্রেনের সঙ্গে তাল রেখে ট্রলি ঠেলে চলেছে। ট্রলির উপর আবার আলো রাখা হয়েছে, যেটা না থাকলে মন্দার বোসকে দেখাই যেত না, ফলে ছবিও উঠত না।

প্রায় মিনিট খানেক চলার পর শট্ নেবার ব্যবস্থা এল। মন্দার বোস এতক্ষণ বাদুড় ঝোলা হয়ে ছিলেন, এবার তাঁকে নির্দেশ দিতে তিনি তাঁর সার্কাসের খেল দেখিয়ে দিলেন আর আমাদের এই সুকঠিন শট্‌টি একবারেই উতরে গেল।

এই ট্রেনের শুটিংটা এমন একটা জায়গায় হয়েছিল যেখানে দর্শকের ভিড়ের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওই একটা ব্যাপারে তাই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম। কাশীতে বাঙালিটোলার গলিতে শুটিং-এর টাইম রাখা হয়েছিল রাত আটটা। ফেলুদা তোপ্‌সে আর লালমোহন রাত্রের খাওয়া সেরে গলিতে বেড়াতে বেরিয়েছে। শখটা লালমোহনেরই, কারণ আগামী উপন্যাসের জন্য সে বেনারসের গলির অ্যাটমসফিয়ারটা একটু চোখে দেখতে চায়। জনমানবশূন্য থমথমে গলিতে তিনজনে গল্প করতে করতে হেঁটে যাবে, আর তার পাশেরই একটা গলিতে ঠিক সেই সময়েই একটা রক্ত-হিম করা খুন হবে। দৃশ্যটার জন্য যে ডায়ালগ লেখা হয়েছে সেটা বলতে গেলে কতখানি পথ হাঁটতে হবে সেটা হিসেব করে পর পর তিনটে গলি বাছা হয়েছে পাঁড়ে হাউলিতে। আমরা আগের দিন রাত্রে গিয়ে দেখে এসেছি যে জায়গাটায় এমনিতে প্রায় আলো নেই বললেই চলে। রাস্তার আলো জ্বললেও তাতে পথচারীর খুব একটা সুবিধে হয় না। কাজেই পুরো জায়গাটাকেই আলো করতে হবে

আমাদের স্টুডিওর আলো দিয়ে। কথা ছিল ইলেকট্রিশিয়ানরা চলে যাবে ছ'টায়, আমরা বাকিরা অভিনেতা সমেত হাজির হব আটটায়।

ঘড়ি ধরে সময়মতো গিয়ে গলির অবস্থা দেখে চক্ষুস্থির। আমাদের বাছাই করা দুটো গলির ঠিক মধ্যিখানে একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গায় কমপক্ষে হাজার লোক জমায়েত হয়েছে—তার মধ্যে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি বাঙালি পশ্চিমা কিছুই বাদ নেই। সত্যি বলতে কি, আমরা যে একটু নড়েচড়ে কাজের জন্য তৈরি হব তারও কোন উপায় রাখেনি বাঙালিটোলার অধিবাসীরা। সবাই অনড় হয়ে শুটিং দেখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন ; অথচ এই সামান্য বুদ্ধিটুকু কারুর নেই যে এ অবস্থায় শুটিং-এর কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

গলা তুলতে হল (হাজার লোকের সমবেত গুঞ্জনে কোলাহলটাও জমেছে ভালই!) তারস্বরে জানিয়ে দেওয়া হল যে লোক না সরলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। বার পাঁচেক বলেও যখন কোনও ফল হল না তখন আমার লোকদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে হোটেলে ফিরে যাবার আদেশ দিয়ে দিলাম। কলকাতায় ফিরে গিয়ে স্টুডিওতে কাশীর গলি তৈরি করে নিয়ে কোনও রকমে কাজ সারতে হবে। এখানে হবে না।

হোটেলে ফিরে রাত্রের খাওয়া সেরে শোবার তোড়াজোড় করছি এমন সময় সদর দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি দুই যুবক দণ্ডায়মান। যে পাড়ায় শুটিং করতে গিয়েছিলাম এরা নাকি সেই পাড়ারই ছেলে, আমার হাতে পায়ে ধরে বলল, 'দাদা, কাল আবার আসুন, একটু রাত করে আসুন ; গ্যারেন্টি দিচ্ছি কোনও ভিড় হবে না। আপনি কাশীতে এসে আমাদের পাড়ায় কাজ না করে ফিরে গেলে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। চিরকালের জন্য কাশীর একটা কলঙ্ক থেকে যাবে'—ইত্যাদি।

অনেক ভেবে পরদিন আর একটা চেষ্টা দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বললাম, 'গিয়ে ভিড় দেখলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরে আসব।'

এঁরা যে কথা রাখতে পারবেন সেটা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি ; কিন্তু আশ্চর্য!—দ্বিতীয় দিন রাত এগারোটায় পৌঁছে তিনটে পর্যন্ত আমরা যেভাবে নির্বিঘ্নে কাজ করলাম, তেমন স্টুডিওতেও হয় না। একটা ব্যাপারে একটু মুশকিলে পড়তে হয়েছিল ; বাঙালির দোকান 'রিঙ্কু সিল্ক হাউস'-এর লোক আমাদের ছবি মারফত যাতে তাদের দোকানের বিজ্ঞাপন হয় সেই মতলবে দিনের বেলা কখন জানি এসে গলির সর্বত্র তাদের দোকানের নাম লেখা পোস্টার আটকে দিয়ে গেছে। যে দিকে তাকাই বাড়ির দেয়ালে, পাঁচিলে, মন্দিরের গায়ে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে—সব জায়গায় জাজ্জ্বল্যমান হয়ে আছে 'রিঙ্কু সিল্ক হাউস।' যাঁর

কীর্তি তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলা হল যে বিজ্ঞাপনগুলো থাকতে দিলে একটা ভয় আছে যে লোকে ফেলুদাকে না দেখে শুধু ওগুলোই দেখবে, আর তার ফলে তাঁর দোকানের লাভ হলেও আমাদের ছবির ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং ওগুলি তুলে ফেলা দরকার। ভদ্রলোক একটু মুসড়ে পড়লেও তাঁকে তোয়াজ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না ; ভানু এবং দলের কয়েকজন মিলে আধঘণ্টার মধ্যে দু-একটা বাদে সব পোস্টার তুলে ফেলে দিল।

এখানে এই দৃশ্যে সাউন্ড রেকর্ডিং করার কথাটা একটু বলি। আউটডোরে যে সব দৃশ্যে কথাবার্তা থাকে সেগুলো তখন-তখন রেকর্ড করা হলেও ছবিতে ব্যবহার করা চলে না, কারণ অন্যান্য শব্দের জন্য কথা পরিষ্কারভাবে রেকর্ড হয় না। সে সাউন্ডটা তোলা হয় সেটাকে বলে 'গাইড ট্র্যাক' ; পরে স্টুডিওতে ফিরে এসে এই গাইড ট্র্যাক শুনে অভিনেতাদের দিয়ে হুবহু সেইরকম ভাবে কথা বলিয়ে আবার রেকর্ডিং করা হয়। আমাদের এই গলির দৃশ্যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেটা হল তিনজন দূর থেকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে, এই কথা যিনি রেকর্ড করবেন তিনি থাকবেন কোথায়? তিনি ত আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে পারবেন না, তা হলে তো তাঁকে ক্যামেরায় দেখা যাবে।

বাঙালিটোলার এই দৃশ্যের সাউন্ড তোলার জন্য আমরা একটা ফন্দি বার করেছিলাম। লালমোহনের কাঁধে দিয়েছিলাম একটা ঝোলা, আর ঝোলার মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছিল একটা ছোট্ট ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার। শট্‌টা শুরু হবার ঠিক আগে সেটা চালু করে দেওয়া হত, আর শট্ শেষ হলে সেটা ঝোলা থেকে বার করে দেখে নেওয়া হত কথা ঠিক বোঝা যাচ্ছে কি না। বলা বাহুল্য, ঝোলা লালমোহনের কাঁধে থাকলেও টেপ রেকর্ডারে তিনজনের কথাই দিব্যি রেকর্ড হয়ে যেত।

কাশীতে আমরা সবশুদ্ধ তেরোদিন শুটিং করেছিলাম। দিনে তিন মিনিটের হিসেবে দেখা যায় এই শুটিং-এ জয়বাবা ফেলুনাথ-এর তিন ভাগের এক ভাগ তোলা হয়ে গিয়েছিল।

তোমার পায়ে পড়ি বাঘ মামা

হীরক রাজার রাজকোষে সিন্দুক বোঝাই হীরে। সেই হীরের বেশ কিছুটা বার করে আনতে হবে গুপী বাঘাকে, কারণ পেয়াদাদের ঘুষ দিতে হবে। দুষ্টু রাজাকে গদি থেকে নামানো চাই ; কাজটা অনেক সোজা হয়ে যায় যদি পেয়াদাদের হাতে আনা যায়। পাঠশালার উদয়ন পণ্ডিতের ফন্দি এটা। অত্যাচারী রাজাকে শায়েস্তা করতে গুপী-বাঘা উদয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

গুপী-বাঘা রাজকোষের সামনে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে প্রহরী টহল দিচ্ছে। গুপী-বাঘা গান গেয়ে তাকে বশ করে দড়ি দিয়ে হাত পা আর গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে, ট্যাঁক থেকে চাবি নিয়ে ঢাউস তালা খুলে তো রাজকোষে ঢোকে। তাদের ধারণা আর কোনও বাধা নেই ; এবার সিন্দুক খুলে হীরে বার করলেই হল। কিন্তু সিন্দুকের তিনটে তালার তিনটে চাবি পাহারা দেবার জন্য যে বাঘমামা বসে আছেন রাজকোষের ভিতর সেটা তারা জানবে কী করে ? অবিশ্যি বাঘকেও গান গেয়ে বশ করা যায়। কিন্তু গুপীর গলা যে শুকিয়ে কাঠ, গান বেরোবে কী করে ?

অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বেরোল গান—

'পায় পড়ি বাঘ মামা
কোরো নাকো রাগ মামা
তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত ?'

বাঘমামা বশ হলেন। পরে তাঁর উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাঘা রিং সমেত তিনটে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে হীরে বার করে নিল।

এই তো দৃশ্য। তোমাদের মধ্যে যারা হীরক রাজার দেশে ছবি দেখেছ তারা এই দৃশ্য পর্দায় দেখেছ। এবার সেই দৃশ্য তোলা হয়েছিল কী ভাবে সেইটে তোমাদের বলি।

আজকাল অনেক হিন্দি ছবিতেই বাঘ সিংহের খেলা দেখা যায়। এই বাঘ সিংহের বেশির ভাগই আসে মাদ্রাজ থেকে। তোমরা জান যে আজকাল সার্কাস মানেই দক্ষিণ ভারতের সার্কাস। আমরা তাই ঠিক করেছিলাম যে বাঘের এই দৃশ্যটা মাদ্রাজের স্টুডিওর মধ্যেই তৈরি হবে। আর বাঘকেও আমরা এনে ফেলব এই স্টুডিওর ভিতরেই। দশ বছর আগে গুপী গাইন ছবিতে বাঘকে নিয়ে যেতে হয়েছিল গ্রামের বাঁশবনে। সে এক অভিজ্ঞতা, আর এবার হল সম্পূর্ণ আর এক অভিজ্ঞতা।

প্রথমে মাদ্রাজে ভাড়া পাওয়া যায় এমন বাঘের খোঁজ করার জন্য মাদ্রাজেরই বাসিন্দা এক বাঙালি ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এনার সিনেমা জগতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, বাঙালিরা ওখানে শুটিং করতে গেলে তাদের নানারকম ভাবে সাহায্য করেন, এমন একটা খ্যাতিও আছে। আসল নামটা লিখলে মুশকিল হতে পারে তাই এঁকে ব-বাবু বলেই বলব। ব-বাবু জিজ্ঞেস করে পাঠালেন বাঘকে নিয়ে ঘটনাটা কী। আমরা তাঁকে জানালাম। উনি এবার অনুরোধ জানালেন বাঘের সামনে যে গানটা গাওয়া হবে সেই গানের একটা টেপ পাঠিয়ে দিতে। সেইটে বেশ কয়েকদিন ধরে বাঘকে শোনানো হবে। তাতে নাকি বাঘের সুবিধে হবে। ছবি শুরু হবার আগেই ছবির গান রেকর্ড করা হয়। আমরা একটা ক্যাসেটে 'পায় পড়ি বাঘমামা' গানটা রেকর্ড করে ব-বাবুকে পাঠিয়ে দিলাম।

শুটিং-এর দিন-দশেক আগে আমাদের দলের অশোক বোস চলে গেলেন মাদ্রাজের প্রসাদ স্টুডিওর ভিতর রাজকোষ তৈরি করার জন্য।

কাঠের কাঠামোর উপর প্লাস্টার দিয়ে সাধারণত স্টুডিওর বাড়িঘর তৈরি হয় ; দেখে বোঝার উপায় নেই যে সেটা নিরেট ইট পাথরের তৈরি নয়। কেবল আঙুল দিয়ে টোকা মারলে ঠক ঠকের বদলে ঢপ ঢপ শব্দ শুনলে বোঝা যায় সেটা ফাঁপা।

যে ঘরে সিন্দুক তারই লাগোয়া একটা ঘরে থাকবে বাঘ ; দুই ঘরের মাঝখানে দরজার বদলে থাকবে একটা খিলান। বাঘের মাথার উপরে দেয়ালে একটা পেরেকে ঝোলানো থাকবে চাবির রিং।

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম শুটিং-এর দু' দিন আগে। মনে ভারি উৎকণ্ঠা, ক্যাসেট শোনা বাঘের চেহারাটা কি রকম সেটা জানা নেই, বেশ তাগড়াই বাঘ না হলে দৃশ্য একেবারেই জমবে না। ব-বাবু মুখে যাই বলুন না কেন, নিজের চোখে না দেখা অবধি মনে সোয়াস্তি নেই। তাই পৌঁছুবার পর দিনই সকালে ব-বাবুর সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম বাঘের আস্তানায়। বাঘ ছাড়াও অন্য জানোয়ার আছে এখানে। একটা ছাউনির নীচে একটি বাচ্চা হাতিকে দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত আগুপিছু দুলছে। ব-বাবু এক ছড়া কলা কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন ; একটার পর

একটা কলা হাতির মুখে পুরে দিতে লাগলেন। বাঘ দেখতে এসে হাতি কেন? তার কারণ বাঘের ট্রেনার একটু বাইরে গেছেন, এই এলেন বলে।

ট্রেনার আসার পরে একটা ঘরের মধ্যে খাঁচায় পোরা বাঘের চেহারা দেখানো হল আমাদের। এই বাঘই নাকি এতদিন ক্যাসেটে 'পায় পড়ি বাঘমামা' শুনে একেবারে তৈরি হয়ে আছে।

আবছা অন্ধকারে বাঘ দেখে মন ভরল না। ট্রেনারকে বললাম 'ওটাকে বাইরে বার করা যায় না?'

'জরুর', বললে ট্রেনার।

'তা হলে তাই করো। আমরা খোলা মাঠে বাঘটাকে দেখতে চাই।'

ট্রেনারের খুব উৎসাহ আছে বলে মনে হল না, আর ব-বাবু যেন কেমন সিটিয়ে গেছেন। ব্যাপারটা কী?

কারণটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না। খাঁচা থেকে মাঠে বার করতেই বুঝলাম সে বাঘের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। সত্যি বলতে কি, এমন শুকনো ঘোলাটে চোখ, লোম খসে পড়া, খিট্‌খিটে বুড়ো বাঘ এক গ্রামের সার্কাসের বাইরে আমি আর দেখিনি। সে বাঘ মাঠে নেমেই ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ করে তার বিরক্তি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এই বাঘ পাহারা দেবে হীরকের রাজকোষ? হতেই পারে না।

ব-বাবুর দিকে চাইতে দেখি তিনি অপরাধী ভাব করে মুখ আমসি করে দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম, 'আপনি বলতে চান ম্যাড্রাসের সেরা শেখানো-পড়ানো বাঘ এটাই?'

ব-বাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। এই সেই বাঘ, একেই গান শোনানো হয়েছে, আর এই বাঘের ট্রেনারকেই দেওয়া হয়েছে দু' হাজার টাকা আগাম। যেখানে একটা ফিল্মে দশ-পনেরো লাখ টাকা খরচ সেখানে দু' হাজার টাকা বেশি কিছু নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে এত তোড়জোড় করে পুরো দল নিয়ে মাদ্রাজ আসা হয়েছে, স্টুডিওতে রাজকোষ তৈরি হয়ে পড়ে আছে, পরশু শুটিং, অথচ মনের মতো বাঘ পাওয়া গেল না। এখন হবে কী?

আমার মনে খট্‌কা লাগছিল, কারণ হিন্দি ফিল্মে দুর্দান্ত সব বাঘ-সিংহ দেখেছি, আর জানি তারা এসেছে মাদ্রাজ থেকেই। সেই সব বাঘ-সিংহ গেল কোথায়? ব-বাবুকে প্রশ্ন করে কোনও জবাব পাওয়া গেল না। তিনি কেবল বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন 'এটাই বেস্ট'।

ঘোর দুশ্চিন্তা নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। ব-বাবুকে মিঠে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলাম যে আজ বিকেলের মধ্যে ভাল বাঘের সন্ধান চাই, না হলে তুলকালাম কাণ্ড হবে।

বিকেলে যখন স্টুডিওতে গেলাম তখন দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। এবার যাকে বলে একেবারে প্যানিক। বুঝলাম যে সব ভেস্তে যেতে চলেছে। আমার দৃশ্য হয় ছবি থেকে বাদ পড়ে যাবে, আর না হয়—যেটা আরও খারাপ—ওই ঘেয়ো বাঘকে নিয়েই কোনওরকমে তুলতে হবে দৃশ্যটা।

স্টুডিওতে পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ব-বাবু ব্যস্তভাবে এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, কাছাকাছির মধ্যেই এক ট্রেনারের সন্ধান পাওয়া গেছে যার কাছে খুব ভাল বাঘ আছে। কালকের শুটিং এর জন্য নাকি সে বাঘ পাওয়া যাবে।

বেরোলাম গাড়িতে করে। ব-বাবু নির্দেশ দিচ্ছেন। মিনিট খানেক চলার পরেই বললেন, 'এসে গেছি'।

বাইরে থেকে দেখে বোঝবার জো নেই। রাস্তার পাশেই একটা টিনের ছাউনি দেওয়া খোলা জায়গা তার পিছনেই ট্রেনারের বাড়ি। বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না। গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা যেতেই বাঁয়ে একটা খাঁচা পড়ল। তাতে একটি চিতাবাঘ। তার পর ঘেঁষাঘেষি তিনটে খাঁচার একটায় আর একটা চিতা, একটায় সিংহ আর একটায় বাঘ।

বাঘ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল, ধড়ে প্রাণ এল। এই ঘুপচি পরিবেশে এমন একটা রাজকীয় জানোয়ার, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি, এ ভাবা যায় না।

ট্রেনারটিও দেখবার মতো। নাম টাইগার গোবিন্দরাজন্। এখানে যত বাঘের জোগানদার আছে সকলেই তাদের নামের আগে টাইগার জুড়ে দেয়। ইনি আসলে রাজস্থানের লোক, তবে বহুদিন মাদ্রাজে প্রবাসী এবং নামটাও বদলে মাদ্রাজি করে নিয়েছেন। এক কালে সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এখন ফিল্মে জানোয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ধরেছেন। ভদ্রলোক নিজেই বললেন যে তিনি নাকি পাঁচ বার বিয়ে করেছেন; এখন যে মহিলাটি সঙ্গে আছেন তিনি নাকি পাঁচ নম্বর স্ত্রী। দুজনেই জানোয়ার ট্রেন করেন।

'আমার বাঘকে দিয়ে কী কাজ করাতে চান?' জিজ্ঞেস করলেন টাইগার গোবিন্দরাজন্। বললাম, 'খুবই সহজ ব্যাপার। একজন গান গাইবে। বাঘ একটা ঘরের কোণায় চুপচাপ বসে সে গান শুনবে।'

গোবিন্দরাজন্ বিরসভাবে মাথা নাড়লেন—'যে লোক জেট প্লেন চালায় তাকে যদি বলা হয় তুমি গরুর গাড়ি চালাও সে কি পারবে? আমার বাঘ লড়াকু বাঘ। বোম্বাইয়ের বড় বড় স্টারের সঙ্গে লড়েছে সে। সে চুপচাপ বসে থাকবে কী করে?'

মহা মুশকিল। বললাম, 'তুমি বাঘকে নিয়ে এসো স্টুডিওতে। তার পর দেখা যাক কী করা যায়।'

আমাদের কথা শুনে বোধ হয় ভদ্রলোকের একটু অনুশোচনা হয়েছে। বললেন, 'ঠিক আছে। এর জন্যে আমার ট্রেনিং-এর কোনও দরকার হবে না। যা করবার আমার স্ত্রীই করবেন।'

গুপী গাইনে যে বাঘের দৃশ্য তুলেছিলাম, তাতে গুপী বাঘার বা আমাদের বাঘের কাছে যাওয়ার কোনও দরকার হয়নি। বাঘ ছিল অন্তত বিশ-ত্রিশ হাত দূরে বাঁশবনের মধ্যে। বাঘের গলার বকলশের সঙ্গে বাঁধা ছিল মজবুত তার। আর সে তারের অপর প্রান্ত ছিল ট্রেনারের হাতে। এবারের দৃশ্যে তারের ব্যবহার অচল, কারণ ক্যামেরা থাকবে বাঘের খুব কাছে। ছবিতে তার বোঝা গেলে খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে। তা ছাড়া এখানে বাঘাকে একেবারে বাঘের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে সিন্দুকের চাবি নিতে হবে।

সিনেমার বাঘ ব্যবহারের যা রীতি, সেই অনুযায়ী বাঘকে শুটিং-এর আগে আফিম জাতীয় কিছু খাইয়ে খানিকটা নিস্তেজ করে নিতে হয়। আমরাও সেটা করব বলে ঠিক করেছিলাম। যদি ট্রেনারের উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা সম্ভব হত তা হলে হয়তো এটা না করলেও চলত ; কিন্তু গোবিন্দরাজনের হাব ভাব ঠিক ততটা ভরসা উদ্রেক করার মতো নয়। এখানে বলে রাখি যে বাঘ নেশা করে এলেও, সে নেশা যে খুব বেশিক্ষণ টেকে না সেটা শুটিং করতে করতেই বুঝেছিলাম।

শুটিং-এর দিন সকলের স্টুডিওতে ন'টায় হাজিরা। বাঘকে বলা হয়েছিল দশটায় আসতে। গাড়ির ওপর স্পেশাল খাঁচায় বাঘমশাই হাজির হয়ে গেলেন ঠিক টাইমমাফিক। খাঁচার তলায় চাকা লাগানো। বাঘশুদ্ধ খাঁচাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হল একেবারে রাজকোষের দরজার সামনে। তার পর বাঘমশাই খাঁচা থেকে বেরিয়ে, তাঁর যে ঘরে থাকার কথা সেই ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে ট্রেনারগিন্নি আর আর একটি তরুণ বয়সের লোক, দেখে মনে হল বাঘটার সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত। গোবিন্দরাজন্ নিজে প্রায় বিশ হাত দূরে একটা দশ ফুট উঁচু তড়পার উপরে চড়ে বসেছেন সেইখান থেকে খেলা দেখবেন বলে। আমাদের দলের লোকেদের সকলের মনের অবস্থা আলাদা করে বর্ণনা করা মুশকিল ; সকলকেই বাইরে একটা ডোন্ট-কেয়ার ভাব রাখতে হয়েছে যেন বাঘকে নিয়ে শুটিং হচ্ছে সে আর এমন কি কথা। কিন্তু আমি নিজে বলতে পারি যে ভয় না পেলেও, এত কাছে একটা খোলা বাঘ থাকলে নাড়ির গতি আপনা থেকেই একটু দ্রুত হয়ে যায়।

বাঘার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন সেই রবি ঘোষের জীবনে আজ একটা মার্কা মারা দিন। অভিনয়ের সঙ্গে তাঁর সাহসের পরীক্ষাও হতে চলেছে আজকে। তাঁকেই আজ বাঘের সবচেয়ে বেশি কাছে যেতে

হবে।

নেশাই হোক আর যাই হোক, বাঘকে এক জায়গায় চুপ করে বসিয়ে রাখা যে কী দুরূহ ব্যাপার সেটা সে দিন বুঝেছিলাম।

প্রথমে বাঘের একার শট্‌গুলো নেবার ব্যবস্থা হল। ক্যামেরা বাঘের থেকে দশ হাত দূরে দাঁড় করিয়ে তাতে চোখ লাগিয়ে অপেক্ষা করছি ; যেই বাঘ ছটফটানি বন্ধ করে আমাদের দিকে চাইছে, অমনি ক্যামেরা চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যতক্ষণ বাঘ অনড়, ততক্ষণ ছবি উঠেছে। এই টুকরো টুকরো শট্ থেকে আবার সবচেয়ে ভাল অংশগুলো কেটে গানের ফাঁকে ফাঁকে জুড়ে দিলে পর্দায় মনে হবে বাঘমামা তন্ময় হয়ে গান শুনছেন।

ঘণ্টা খানেক কাজের পর একটা জিনিস লক্ষ করলাম সেটা আগে কখনও দেখিনি। মাদ্রাজের গরম আবহাওয়া আর স্টুডিওর আলোর উত্তাপ মিলে রাজকোষের ভিতরটা প্রচণ্ড গরম। আমরা সকলেই ঘামছিলাম ; এখন দেখলাম বাঘেরও সর্বাঙ্গে লোমের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। বাঘ বা অন্য কোনও জানোয়ার যে এভাবে ঘামতে পারে সেটা আগে জানা ছিল না। গোবিন্দরাজন্ এবার তড়পা থেকে নেমে এসে বললেন, 'ওকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনা দরকার। আপনারা কিছুক্ষণের জন্য কাজ বন্ধ করুন।'

রাজকোষের দরজার মুখে খাঁচা-গাড়ি রাখাই ছিল। বাঘমামা গাড়ি চড়ে স্টুডিওর বাইরে বেরিয়ে গেলেন মিনিট পনেরো হাওয়া খাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে আমরা এর পরের শট্-এর তোড়জোড় করে নিলাম।

গোলমেলে শট্‌গুলো আগে নিয়ে নেব বলে বাঘাকে বললাম, 'এবার তুমি তৈরি হও'। ট্রেনারকে কাজের শুরুতেই বলেছিলাম, 'আমাদের এক জন অভিনেতাকে বাঘের খুব কাছাকাছি যেতে হবে ; তাতে কোনও গোলমাল হবে না তো ?' ট্রেনার বলেছিল, 'বাঘের নাম উমা। যিনি বাঘের কাছে যাবেন, তিনি যেন সেই সময় নামটা বলতে বলতে যান। বাঘ তা হলে ভাববে চেনা লোক আসছে, আর তা হলেই সে কোনও গণ্ডগোল করবে না।' বাঘ যে আসলে মামা নন, মাসি, সেটা তখনই প্রথম জানতে পেরেছিলাম।

বাঘ হাওয়া খেয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল। সকাল থেকেই অনেকবার 'উমা, উমা' বলতে বলতে বাঘের কাছে এগিয়ে গিয়ে বাঘা রীতিমতো সাহসের পরিচয় দিয়েছে। বাঘও কোনও আপত্তি করেনি। ট্রেনারের ধারণা বাঘের বাঘাকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে। সেটা অবশ্যি সকলের পক্ষেই ভাল। শট্-এর আগে বাঘা আর বার চারেক বাঘের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তার দিকে এগিয়ে গেল। পরে বাঘা বলেছিল দিনের শেষে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার চাপে তার নাকি প্রায় জ্বর এসে

গিয়েছিল, যদিও শুটিং-এর সময় সেটা মোটেই বুঝতে পারা যায়নি।

দৃশ্যটা যাতে আরও জমে, তাই বাঘাকে দিয়ে শুধু বাঘের উপর থেকে চাবি নিতে দেখানো হয়নি ; কাজটা করতে গিয়ে তাকে টাল হারিয়ে দেওয়ালের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখানো হয়েছিল। তার শরীরটা বাঘের উপর দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা, তার হাত যেন দেওয়ালে আটকে গেছে, সে চেষ্টাও করে নিজেকে সোজা করে পিছিয়ে আসতে পারছে না।

এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য গুপীকে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গিয়ে বাঘার কোমর ধরে টেনে আনতে দেখানো হয়েছিল। এই দৃশ্যে ট্রেনার-গিন্নির ধমকানি আর অন্য ছেলেটির আপ্রাণ চেষ্টার ফলে বাঘ মোটামুটি ভদ্র ব্যবহারই করেছিল।

গোলমালটা শুরু হল টিফিনের পর থেকে। স্টুডিওর শুটিং-এ টিফিনের ছুটি হয় একটা থেকে দুটো পর্যন্ত। এই সময়টাতে আমাদের কাজ এগিয়ে রাখলাম। বাঘ যে দেওয়ালের সামনে বসেছে, সেই প্লাস্টারের দেওয়ালের খানিকটা অংশ কেটে ফেলে একটা চতুষ্কোণ ফাঁক তৈরি করে তার পিছনে ক্যামেরা বসানো হল। এই ফাঁকের ঠিক মধ্যিখানে ছিল একটা ইঞ্চি চারেক চওড়া আড়াআড়ি কাঠের তক্তা—সেটা আসলে কাঠামোর অংশ। এই তক্তার ঠিক ওপরের ফাঁকটায় ক্যামেরার লেন্স এমন ভাবে বসানো হয়েছে যাতে শট্‌টা নিলে দেখা যাবে বাঘ বসেছে ক্যামেরার ঠিক সামনে, গুপী বাঘা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে সিন্দুকের ঘরে।

বাঘ বাইরে গিয়েছিল হাওয়া খেতে। আমরা তৈরি হলে পর তাকে আবার ফিরিয়ে এনে জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ এবার জায়গাটা হল ক্যামেরার তিন হাত সামনে। ভরসা মাঝখানের ওই কাঠের তক্তা।

কিন্তু এবার আর বাঘ কিছুতেই বসে থাকতে চায় না। ট্রেনার-গিন্নির ধমক সত্ত্বেও বার বার উঠে পায়চারি করে, ছটফট করে। বোঝা গেল নেশা কাটতে শুরু করেছে, লড়াকু বাঘের এখন লড়াইয়ের মেজাজ এসে গেছে। অথচ আমাদের দেখাতে হবে বাঘ এখনও শুনছে, এখনও তন্ময়।

ক্যামেরার দু' হাত পিছনে স্টুডিওর আসল দেওয়াল। সেই সংকীর্ণ জায়গায় আমরা ঘর্মাক্ত দেহে চারজন লোক বসে আছি বাঘের কখন মর্জি হয় তার অপেক্ষায়—লেন্সে চোখ লাগিয়ে আমি, আমার ডান পাশে নিকন ক্যামেরা হাতে আমাদের স্টিল ফটোগ্রাফার নিমাই ঘোষ, আমার বাঁয়ে ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু ও আমার অন্যতম সহকারী সন্দীপ। গুপী বাঘাও রেডি হয়ে আছে। সিন্দুকের ঘরে। গানের প্লে-ব্যাক বার বার চলছে বার বার থামছে।

এক ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর কী কারণে বাঘমামা কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হলেন, যে দিকে চাওয়ার দরকার সে দিকেই চাইলেন আর আমাদের শট্‌ও হয়ে গেল। কিন্তু শট্ হবার পরমুহূর্তে যেটা ঘটল সেটা ভাবতে এখনও ঘাম ছুটে যায়। বাঘ এতক্ষণ ক্যামেরা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। হঠাৎ কেন জানি এক ঝটকায় ক্যামেরার দিকে ফিরে তার ডান পা-টা তুলে মরিয়া হয়ে থাবা দিয়ে এক প্রচণ্ড চাপড় মারল সেই কাঠের তক্তাটার উপর। সে চাপড় আর ছ' ইঞ্চি ডান দিকে পড়লেই আমাদের ক্যামেরার লেন্‌স ভেঙে চুরমার হয়ে যেত।

দিনের শেষে 'প্যাক্ আপ' বলার পর ট্রেনার তাঁর বাঘকে খাঁচায় পুরে নিয়ে গেলেন। নেওয়া মাত্র শুরু হল বাঘের গগনভেদী হুংকার। একটানা পাঁচ মিনিট ধরে হুংকার দিয়ে তাঁর উপর আমাদের সারাদিনের জুলুমের ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে তবে বাঘমামা ক্ষান্ত হলেন।